বৈষম্যবিরোধী
ছাত্র গণ-আন্দোলন
রাজশাহী বিভাগ

অক্টোবর ২০২৪ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

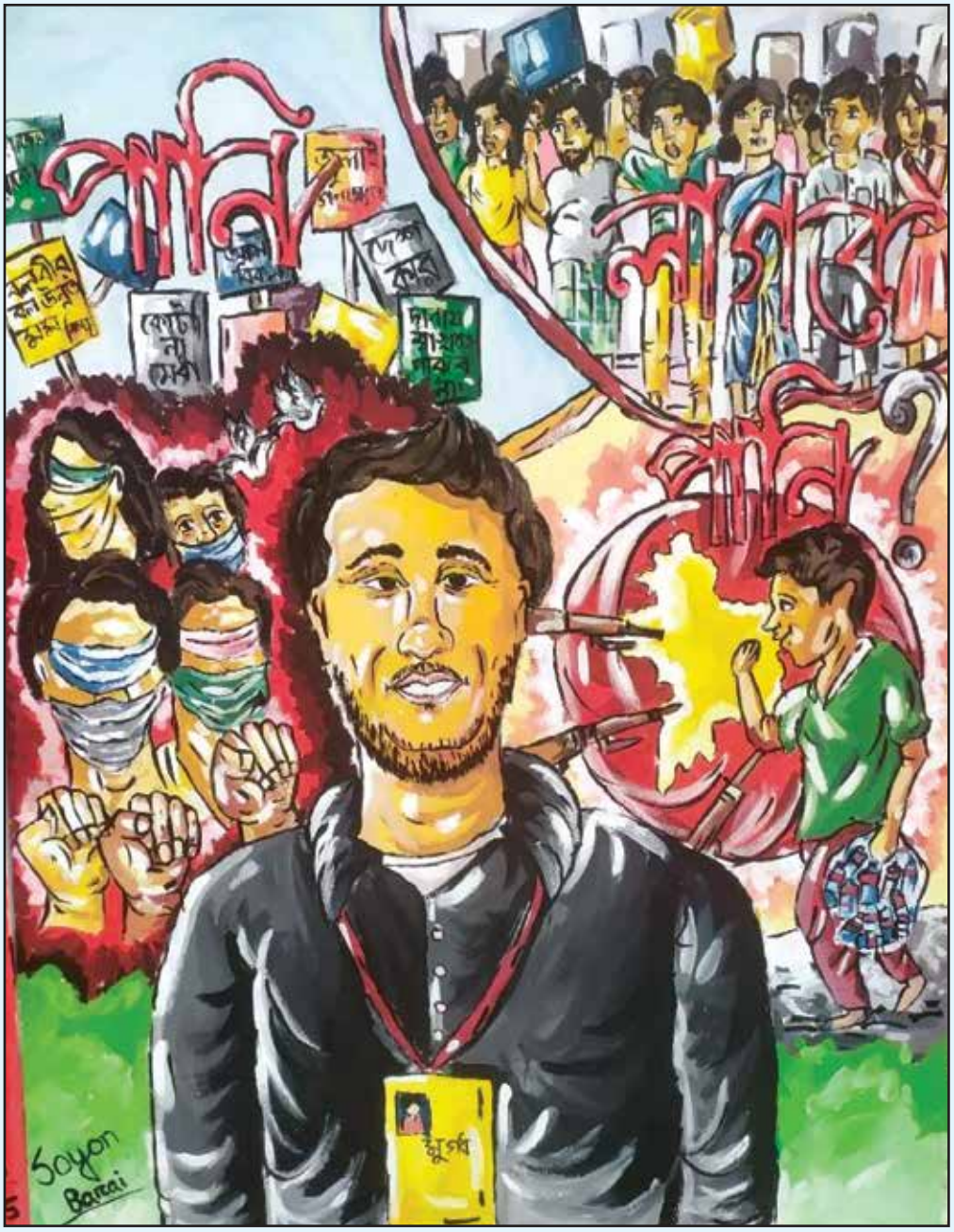

পানি
লাগবে
পানি?
Sayon Barai

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অক্টোবর ২০২৪ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন
বিশেষ সংখ্যা: রাজশাহী বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১০ই ডিসেম্বর ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদ্‌যাপন ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত 'জুলাইয়ের কন্যারা আমরা তোমাদের হারিয়ে যেতে দেব না' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

তারুণ্য এক প্রত্যয়, চেতনার উৎস, অনুপ্রেরণার অজেয় শক্তি। যারা নিজ প্রতিভায়, উদ্যমে, কর্মযজ্ঞে বদলে দেয় পৃথিবী তারাই তো চিরনবীন। তাদের নিয়েই তো নজরুল-সুকান্ত রচনা করেছেন দ্রোহের-বিপ্লবের হাজারো গান-কবিতা, যা মর্মে মর্মে জাগায় জয়ের প্রতিধ্বনি। কবি হেলাল হাফিজের বিখ্যাত উক্তি– 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার'। এ যুদ্ধ অন্যায়, অসত্যের, অবিচার, অধিকার আদায়ের, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা লাভের এবং সর্বোপরি ইতিবাচক পরিবর্তনের। তারুণ্যের শক্তি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের বড়ো হাতিয়ার। এই তারুণ্য এমন একটি শক্তি যা ইচ্ছা করলেই অবদমিত করা যায় না, নষ্ট করে দেওয়া যায় না বা থামিয়েও দেওয়া যায় না। আমরা তারুণ্য বলতে অসম্ভবকে সম্ভব করাই বুঝি। বিশ্বব্যাপী আজ যে পরিবর্তনের জোয়ার, তার মূলে রয়েছে তরুণসমাজের প্রগাঢ় চেতনা আর অবিচল প্রত্যয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি গৌরবময় অর্জনের সার্থক রূপকার আমাদের তরুণসমাজ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ– প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তারুণ্যের শৌর্যদীপ্ত ভূমিকা আমাদের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে। অতন্দ্র-প্রহরী তরুণরাই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শাণিত করেছে। ২০২৪ সালেও বাংলাদেশের তারুণ্যের জয়ধ্বনি গাইছে বিশ্ব। ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোটা সংস্কার আন্দোলন দুর্বার ছাত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকারের দমনপীড়ন উপেক্ষা করে অসংখ্য শহিদের রক্তের বিনিময়ে বিজয় হয় ছাত্র সমাজের। তারুণ্যের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয় চারদিকে। ছাত্ররা নতুন স্বপ্ন নিয়ে আসে।

রাজশাহী রেশমীবস্ত্র, আম, লিচু এবং মিষ্টান্নসামগ্রীর জন্য প্রসিদ্ধ। রাজশাহী শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এ শহরে অবস্থিত। রাজশাহী শুধু শিক্ষানগরী নয়, পরিচ্ছন্ন নগরীও বটে। পদ্মা পাড়ের রাজশাহীর ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের অবদান উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনের প্রতিক্ষণই রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ছিল প্রতিবাদী আর সচেতন। এ আন্দোলনের বিজয় তাদের লড়াই-সংগ্রাম ও আত্মত্যাগে মহীয়ান। তাদের গৌরবগাথা তুলে ধরার জন্য আমাদের এবারের আয়োজন। 'এক দেয়ালেই জুলাইয়ের ইতিহাস', 'গ্রাফিতি-স্লোগানে প্রতিবাদ, সাম্য-অসাম্প্রদায়িক বাংলার বার্তা', 'কোটা না, মেধা হোক যোগ্যতা', 'জুলাই বিপ্লবে নারী' ও 'চব্বিশেও তারুণ্যের জয়ধ্বনি' শীর্ষক নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

সচিত্র বাংলাদেশ অক্টোবর ২০২৪ সংখ্যা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাজশাহী বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার/সংবাদ প্রতিবেদন

তারুণ্যের জয়গান ৪
প্রফেসর ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী

এক দেয়ালেই জুলাইয়ের ইতিহাস ৮

কোটা বাতিলের আন্দোলন: ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের ১১

গ্রাফিতি-স্লোগানে প্রতিবাদ, সাম্য-অসাম্প্রদায়িক বাংলার বার্তা ১২

কোটা সংস্কার আন্দোলন রাবি ও রুয়েটের সম্মিলিত কর্মসূচি ১৫

কোটাবিরোধী আন্দোলন তৃতীয় দিনের মতো রাজশাহীর রেল যোগাযোগ বন্ধ ১৬

চব্বিশেও তারুণ্যের জয়ধ্বনি ১৭
মাহমুদা টুম্পা

ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের ২০

ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ কোটা আন্দোলনকারীদের ২১

কোটা সংস্কার আন্দোলন ও রক্তাক্ত প্রান্তর ২২
অ্যাড. মো. মোজাম্মেল হক

জয়পুরহাটে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া ২৬

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ২৮

কোটা না মেধা হোক যোগ্যতা ২৯
মোহাম্মদ নজাবত আলী

বৃষ্টির মধ্যে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে হাজারও শিক্ষার্থী ৩২

জুলাই বিপ্লবে নারী ৩৩
রহিমা আক্তার মৌ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ ৩৯

সিরাজগঞ্জ-ঢাকা-উত্তরাঞ্চল রুটে দূরপাল্লার বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ ৪০

গেজেট থেকে রাজশাহী বিভাগের শহিদদের তালিকা ৪১

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার তৃতীয়াংশ ৪৬

রাজশাহী কলেজে শহিদদের স্মরণে দোয়া, আট দাবি ঘোষণা ৪৯

বগুড়ায় শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ পোড়া দেয়াল হচ্ছে রঙিন, শৃঙ্খলা ফিরেছে সড়কে ৫১

হাতে হাত রেখে স্লোগানের সময় ঝাঁজরা ভাইয়ের বুক ৫৩

রাজশাহীতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সাথে বাজার তদারকিতেও শিক্ষার্থীরা ৫৪

চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থাকল গুলিতে নিহত রিতার ৫৬

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদদের নামে রাজশাহীর বিভিন্ন চত্বরের 'নামকরণ' ৬৩

রাজশাহীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'শহিদি মার্চ' কর্মসূচি পালিত ৬৪

হামার ছাওয়াল তো নাই, হামিও নাই ৬৫

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর ৬৬
আলম শামস

মায়ের সঙ্গে শেষ কথা নিলয়ের প্রয়োজনে শহিদ হবো তবু আন্দোলনে যাব ৭০

গল্প

মৃত্যু-অধ্যাস ৫৭
রফিকুর রশীদ

অমূল্য রতন ৭১
শ্যামল দত্ত

কবিতাগুচ্ছ: ৬৮-৬৯, ৭৭-৭৯

এস এম তিতুমীর, ফারদিন শামস তিমির, আব্দুল্লাহ আল বাকী, সুফিয়া ডেইজি, তন্ময় নিসার, নাফেয়ালা নাসরিন, জেসমিন নাহার, মো. জামাল উদ্দিন সোহেল মাহবুব, বিপুল চন্দ্র রায়, আশিকুল আলম আসিফ, আবুল কালাম তালুকদার, মাসুম আওয়াল, আব্দুল আউয়াল রণী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা সুজেয় শ্যাম ৮০

তারুণ্যের জয়গান

প্রফেসর ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী

'পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ক্ষমতা হলো তারুণ্য'– চাণক্য।

ইতিহাস গড়ে তরুণরাই, ইতিহাস ভাঙেও তরুণরাই। মানবজীবন চক্রে যে বয়স সবচেয়ে উদ্দাম, ভাস্বর, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, অকুতোভয় দুঃসাহসী, প্রাণ দেওয়ায় থাকে না তোয়াক্কা, অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ায় অসম সাহসে, দুর্বার প্রতিরোধে উচ্চকিত সেই বয়সটাই 'তরুণ' বয়স। যদিও বয়সের ফ্রেমে বাঁধতে চাননি অনেকে তারুণ্যকে, তথাপি অধিকাংশ সময়েই একটি বয়সই তারুণ্যের প্রভায় উদ্দীপিত থাকে। পরিবর্তনের অঙ্গীকারে এগিয়ে যায় তরুণসমাজ। যে-কোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পিছুপা হয় না তারা। একটি রাষ্ট্রের তরুণসমাজ যত শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতি ও মূল্যবোধে অগ্রগামী, সেই রাষ্ট্র তত সমৃদ্ধ। তরুণরাই পরিবর্তনের সূচক। জাতির বিবেক বলা যেতে পারে তরুণদের। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার তারা।

অতীত ইতিহাস বলে, প্রথম ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল চীনে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে। তাদের এই আন্দোলন সাধারণ জনমনে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও সে সময়ের চীন শাসক প্রায় ১৭২ জন ছাত্রকে কারাগারে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সেও ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল। তাদের আন্দোলন ছিল রাজা ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ১৯৪৩ সালে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নাৎসি শাসকের বিরুদ্ধে প্রবল অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের প্রধান ছয়জনকে নাৎসি সরকার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়েছিল। তথাপি জনমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তাদের 'হোয়াইট রোজ আন্দোলন'।

তবে বাংলার ছাত্রদের একবার দুবার নয়, বার বার আন্দোলনে শামিল হতে হয়েছে। প্রাণের বিনিময়ে আদায় করেছে অধিকার। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা

আন্দোলনের ইতিহাসে তরুণ প্রজন্মই ছিল অগ্রনায়ক। ১৯৫২-তে বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রদের আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন অগণিত ছাত্রছাত্রী। ১৯৬২-তে শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে—এদেশের তরুণসমাজ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও আমাদের তরুণদের জয়গাথা উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সংকটে তরুণরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ২০১৮-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং ২০২৪-এর ফ্যাসিবাদের পতনে তরুণ সমাজের আন্দোলন গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

'অরুণ প্রাতের তরুণ দল'-এর শক্তি ও সাহস উন্মোচন করেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অনেক কবিতা ও প্রবন্ধে। ধ্বংস দেখেও যেমন ভয় করে না তরুণসমাজ, তেমনি নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে বুক পেতে দিতেও দুবার ভাবে না। সর্বযুগে সর্বদেশে তরুণদের জয়গাথা ইতিহাস হয়ে আছে। তরুণরা সৃষ্টিমুখর অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার।

ইতিহাস বহন করে সাক্ষ্য ক্ষুদিরামদের, প্রীতিলতা, ইলা মিত্রদের। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে আমাদের ভাষাশহিদদের। মুক্তিযোদ্ধাদের। আমাদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও জুলাই বিপ্লবের অগণিত বিপ্লবীদের।

২০২৪-এর ১৬ই জুলাইয়ের ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এদিন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ-কে প্রকাশ্যে পুলিশ গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই ঘটনায় সারাদেশে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ক্ষমতাসীন শাসকের পতন তখন মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সারাদেশের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে খুব বেশি সময় দাঁড়াতে পারেনি ক্ষমতাসীন সরকার। গোপনে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

'জুলাই বিপ্লব' আমাদের ইতিহাসে শুধু নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও নজির স্থাপন করেছে। এই বিপ্লবের কর্ণধার ছিল আমাদের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী তথা তরুণসমাজ। তরুণরা নিজেরাই নিজেদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদ নির্মূল করতে রাস্তায় নেমেছে। গণ-অভ্যুত্থান এনেছে। ৫ই আগস্ট ফ্যাসিবাদের পতন সম্ভব করেছে তরুণসমাজ। তরুণরা রাষ্ট্রের সবরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সোচ্চার। জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের জাতীয় রাষ্ট্রীয় দুরাচারের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে। কাঁপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বিতাড়িত করেছে ফ্যাসিবাদ।

বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল এদেশের লাখো লাখো তরুণ। প্রাণ দিয়ে লড়েছে। প্রাণ গেলেও শপথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। ফ্যাসিস্ট শক্তির মদদে তাদের দোসররা রক্ত ঝরিয়েছে হাজার হাজার যুবকিশোর তথা তরুণের। তথাপি তারা এগিয়ে গেছে। আর এই সাহস ও প্রাণশক্তি তারুণ্যের ধর্ম। তরুণরা মরণে ডরায় না, জীবন দিয়ে লড়াই করে ততক্ষণ, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে। তারুণ্যের প্রবল ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে পরাজিত হয় দমননীতির মদদদাতা ফ্যাসিস্ট সরকার।

তারুণ্যের বাঁধভাঙা শক্তির জোয়ারের কাছে টেকে না অন্যায় দুঃশাসন উৎপীড়ন। ক্ষমতাশালীর ক্ষমতাও খড়কুটোর মতো ভেসে যায় তারুণ্যের প্রবল স্রোতের টানে। জুলাই বিপ্লব কেবল একটি দীর্ঘমেয়াদি সরকারের পতন নয়, বরং একটি নতুন রাজনৈতিক চেতনার দ্বারোদঘাটন করেছে জুলাইয়ের তরুণরা। রাষ্ট্রের পরাক্রমশালী শক্তি হলো তারুণ্যের শক্তি।

তরুণসমাজকে সঠিক ও শুদ্ধ চিন্তাচেতনায় প্রাণিত ও শাণিত করা হলে, জাতীয় শক্তি হবে সমুন্নত। তরুণসমাজ হবে উদার ও নীতিবান। মানবতাবাদী ও বৈষম্যমুক্ত। তবেই তারুণ্যের শক্তি হবে রাষ্ট্রীয় শক্তির মূলধন।

আমাদের আজকের শিশুকিশোররাই আগামীতে তরুণ হয়ে উঠবে। আমাদের শিশু-কিশোরদের মেধা, মনন, প্রতিভা বিকাশে রাষ্ট্রের অধিক যত্ন ও মনোযোগ জরুরি। আমাদের জনবল জনশক্তিতে পরিণত হবে তখুনি; যখন শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নীতি বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হবে এ সমাজ। তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন কবি-সাহিত্যিকগণ। তরুণদের একতাবদ্ধ শক্তির সামনে টেকে না কোনো দুঃশাসন। 'যৌবনে দাও রাজটীকা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী কথান্তরে তারুণ্যের জয় গেয়েছেন। যে রাষ্ট্রে রয়েছে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত মেধাবী ও দেশপ্রেমিক তারুণ্যশক্তি, সে রাষ্ট্র কখনো পরাজিত হয় না। 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, যে সমাজ যুবশক্তির বলে বলীয়ান সেই সমাজে অন্যায়-অবিচার-অনিয়ম মাথা তুলতে পারে না।

তরুণ প্রজন্ম এমন এক বয়সের বৈশিষ্ট্য বহন করে যে বয়সে থাকে না কোনো পিছুটান, থাকে না মৃত্যু ভয়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণ তথা ১৮ বছর বয়সের স্তুতি গেয়েছেন। 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'– এই কামনা করেছেন। কারণ এ বয়স জানে না ভয়, পদাঘাতে ভাঙতে চায় সকল বাঁধা, প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার বেলাতেও এ বয়স বেশি সাহসী।

রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও আর্থসামাজিক উন্নয়নেও তরুণদের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তরুণরাই। আবার তরুণরাই সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনীশক্তির ধারক ও বাহক। সুষম পরিচর্যায় তরুণসমাজ হতে পারে সৃষ্টিশীল। গবেষণাধর্মী কাজেও উৎসাহী এই বয়সের শিক্ষার্থীরা। যে-কোনো ক্ষেত্রে তরুণ সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে দেশের জন্য তা গৌরব বয়ে আনবে। তরুণ নেতৃত্বকে বিশ্বায়নের মুক্তমঞ্চে উপস্থাপনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হলে দেশের জন্য ইতিবাচক সাফল্য বয়ে আনবে সুনিশ্চিত।

সবশেষে মনীষীদের মন্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বলতে চাই, দেশ জাতি তথা রাষ্ট্র সংস্কার বা বিনির্মাণে তারুণ্যশক্তির বিকল্প নেই। ইতিহাস রচিত হয় তারুণ্যের শক্তির জোরে। তরুণরা তারুণ্য শক্তির অধিকারী, পরিবর্তনই তাদের ধর্ম। আমরা সবসময় আমাদের তরুণদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিতে পারব না হয়ত, কিন্তু আমরা তাদের তারুণ্যকে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগাতে পারি। তরুণরা এগিয়ে যাক নির্ভীকচিত্তে আলোর পথে। তারুণ্যের শক্তিতে সমাজ হোক আলোকিত। দূরীভূত হোক সব অন্যায়, অনাচার আর অব্যবস্থার। হোক তারুণ্যের জয়গান।

প্রফেসর ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী: গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক, falguni.edu@gmail.com

মীর মুগ্ধর নামে স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত হলো বাঁশের সেতু

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া পৌর শহরের বিল সূর্য নদীর সংযোগ খালের ওপর স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশের সেতু তৈরি করা হয়েছে। এর নাম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর নামে রাখা হয়েছে। 'মীর মুগ্ধ' সেতুটি নির্মাণ করেছেন পৌরসভার ঘোষগাঁতী ও ঝিকিড়া এবং পাশের রামকান্তপুর ও চর সাতবাড়িয়ার গ্রামের বাসিন্দারা। এতে এলাকার শিক্ষার্থীরা সহযোগিতা করেছেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে এক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার শিক্ষার্থীদের প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ ঘুরে উল্লাপাড়া সানফ্লাওয়ার স্কুল, মার্চেন্টস পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুল, বিজ্ঞান কলেজসহ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করতে হতো।

সানফ্লাওয়ার স্কুলের শিক্ষক জহুরুল ইসলাম বলেন, পৌরসভার মধ্য দিয়ে যাওয়া বিল সূর্য নদীর সংযোগ খালের ওপর নির্মিত সেতু দিয়ে তাদের স্কুলের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী যাতায়াত করত। সেতু না থাকায় খাল পার হতে তাদের দেড় কিলোমিটার পথ ঘুরে পৌর মুক্তমঞ্চের পাশের ওভারব্রিজ হয়ে আসতে হয়। বাঁশের সেতু নির্মাণ করায় তাদের আসা সহজ হয়েছে।

প্রতিবেদন: অর্ণব দেবনাথ

এক দেয়ালেই জুলাইয়ের ইতিহাস

বগুড়া জিলা স্কুলের দেয়াল জুড়ে তৈরি করা হয়েছে কোটা আন্দোলন থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এবং সরকার পতন। এক কথায় বলতে গেলে ৮ই জুলাই থেকে শুরু করে ৩৬শে জুলাই (৫ই আগস্ট) স্বাধীনতা ২.০ হয়ে উঠার সকল ইতিহাস একটা ফ্রেমে বন্দি করেছেন বগুড়া জিলা স্কুল ও ভিএম স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

রংতুলিতে ফুটিয়ে তোলা শিক্ষার্থীদের এক একটি ছবি যেন আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষণের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আর সেই ছবিগুলো আঁকতে গিয়ে বার বার বুকের ভেতরটা ও হাতের রংতুলিটা কেঁপে উঠেছে শিক্ষার্থীদের। পরিপূর্ণ এই দেয়ালের দিকে তাকালে যে কারও মনে হবে এক মুহূর্তে যেন আবছায়া হয়ে আন্দোলনে ঢুকে গেছেন, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়বেন মুহূর্তে। আবার মনের আনন্দে হেসে উঠবেন এক মুহূর্তে।

গত ১৪ই আগস্ট থেকে ২০শে আগস্ট টানা ৭ দিন সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা কখনও রাত ১১টা অব্দি কাজ করেছে ৪ আয়োজক ও ১২ শিক্ষার্থী। ভঙ্গুর দেয়ালের পোস্টার তোলা থেকে শুরু করে ভাঙা অংশে সিমেন্ট বালুর আস্তরণ তৈরি এবং তা শুকিয়ে সেখানে রং লাগানো। তারপর আন্দোলনের এক-এক করে 'আবু সাইদের বুক চিতিয়ে ধরা থেকে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যাওয়া অব্দি' প্রতিটি ছবি রংতুলিতে ফুটিয়ে তুলেছে তারা।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞে ছিলেন ৪ আয়োজক বগুড়া জিলা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মশিউর শাফি, নূর মোহাম্মদ নাহিদ, ইসতিয়াক আহম্মেদ, ইনতিশার রহমান। রংতুলির ১২ জন হলেন, রিসাদ জামান, ফাইয়াজ রুপান্তর, মুশরাত মাহা, রাইয়্যা খায়ের হাফসা, রাফিয়া খায়ের রিম্মি, মানসুরা, নুজহাত তন্বী, সোহেল, মেহেদী হাসান সিয়াম, গোলাম নিয়ামত কাদির, ওলি ও তাসনিম চূড়া।

এই দেয়ালিকার থিম ধরা হয়েছে বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে। চিত্রটি এক কোনায় শুয়ে দূরবীন দিয়ে আবরার ফাহাদ দেখছেন, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আবু সাইদ, এই বুঝি গুলিতে লুটিয়ে পড়বেন মাটিতে, আরেক পাশে মীর মুগ্ধ হাতে পানির বোতল নিয়ে ডাকছে, কারও পানি লাগবে? পিচঢালা পথ ভেসে যাচ্ছে এক শিক্ষার্থীর বুকের তাজা রক্তে, পুলিশ মুখ চেপে ধরেছে বৈষম্যর প্রতিবাদ রুখে দিতে, আধমরা ছেলেটাকে ফেলে দেওয়া হলো সাঁজোয়া যান থেকে, আন্দোলনকে স্যালুট জানাচ্ছে রিকশাচালক, পাশেই রক্তাক্ত নিথর দেহ নিয়ে যাচ্ছে রিকশার পাটাতনে, অ্যাডভোকেটেরা ছুটলেন আদালতে, ডিবি অফিসের লিখিত স্ক্রিপ্ট পড়ানো হচ্ছে কোটাবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কদের। তারপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রূপ নিলো এক দফা দাবিতে, উত্তাল হলো সারাদেশ, রক্ত ঝরল মাটিতে। হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে গেলেন শেখ হাসিনা। পতন ঘটল হাসিনা সরকারের। গণ- মানুষের জোয়ারের টান গণভবন ও সংসদ ভবনের দিকে, নতুন দিগন্তের সূর্যোদয় হলো বাংলার বুকে, শিক্ষার্থীরা নাম দিলো ৩৬ জুলাই স্বাধীনতা ২.০।

আয়োজকরা বলছেন, ২০১৮ -তে সত্য বলায় যে আবরার ফাহাদ আকাশের তারা হয়েছিলেন, যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন– সেই আবরার ফাহাদকে থিম ধরে বগুড়া জিলা স্কুলের ভেতরে সহশিক্ষা কার্যক্রম ভবনের পশ্চিম পাশের দেয়ালে গত ৮ই জুলাই কোটাবিরোধী আন্দোলন থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতন সবকিছু বন্দি করা হয়েছে রংতুলির আঁচড়ে। বগুড়া জিলা স্কুলের ভেতরে করা এই রংতুলিতে ২০২৪-এর স্বাধীনতার সকল কিছু একফ্রেমে, যা দেশের মধ্যে এটি প্রথম বলে দাবি করেছেন আয়োজকরা।

রংতুলির আঁচড় দিতে গিয়ে বার বার বুক কেঁপে উঠেছে জিলা স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাইয়াজ রূপান্তরের। ফাইয়াজ রূপান্তর বলেন, যখন ছবিগুলোর থিম ধরে-ধরে তুলির আঁচড় দিচ্ছি, বুকটা কেঁপে উঠছিল আর সেদিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নুজহাত তন্বী বলেন, কোটা আন্দোলনে শুরুতে ভালো ছিল। পরের দিকে হলে থাকতে ভয় লেগেছে, ঐ সময়গুলো আতঙ্কে কেটেছে। ছাত্রী হল বন্ধ হলো। ঠিকঠাক বাসায় আসতে পারব কি না, জীবনে শঙ্কা।

আরেক শিক্ষার্থী রাফিয়া খায়ের রিম্মি বলেন, আমরা বুঝাতে চেয়েছি, যে আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সেই কষ্টকর মুহূর্ত ও বিজয়ের আনন্দের মুহূর্ত। ২০২৪-এর যে বিজয় তা এই দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর এই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে।

আয়োজকরা বলেন, আমরা চিন্তা করি সবগুলো ছবি মিলিয়ে একটা বিশাল দেয়ালিকা করার। তখন জিলা স্কুলের এই দেয়ালটি ঠিক করা হয়। তারপর ১৪ই আগস্ট সকাল থেকে ২০শে আগস্ট সন্ধ্যায় গিয়ে পূর্ণ রূপ পায় এই দেয়ালটি। যেখানে ৮ই জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট অব্দি সব কিছু তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়ার সাতমাথা, গণভবন, সংসদ ভবনসহ সকল বিষয়। বগুড়া জিলা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা এই দেয়ালের নাম দিয়েছেন 'দ্য গ্রেট ওয়াল'।

[সূত্র: খবরসংযোগ.কম, ২১শে আগস্ট ২০২৪]

পাটের ব্যাগ চালু করতে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা

বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সারাদেশে পাটের ব্যাগ চালু করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। ২০১০ সালের পণ্যে পাট মোড়কের আইনটি সর্বতোভাবে বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। প্রথমে আটা, চাল, ধানের জন্য ব্যবহৃত ব্যাগে প্রয়োগ করা হবে। সুপারশপগুলোতে প্লাস্টিকের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহারে সার্বিক সহায়তা করা হবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর মতিঝিলে বিজেএমএ ভবনে বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'পরিবেশবান্ধব পাটখাত ও পাট শিল্পের সমস্যা উত্তরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান পণ্যে পাট মোড়ক আইনটির প্রয়োগ না হওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন, প্লাস্টিক ব্যাগে খাদ্যপণ্যের যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে তা থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে। পলিথিন উৎপাদন রোধে ক্যাম্পেইন করা হবে। সভায় পাট পণ্যে যুগোপযোগী প্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহার, অধিকতর গবেষণা, স্বল্প দাম ও সহজলভ্যতা, সহজ শর্তে ঋণ ও প্রণোদনার বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রতিবেদন: আনিকা তাবাসসুম

কোটা বাতিলের আন্দোলন: ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের

বৃষ্টি উপেক্ষা করে কোটা বাতিলের দাবিতে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। ৪ঠা জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে, দুপুর ১২টার দিকে তারা মহাসড়ক থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীদের 'বঙ্গবন্ধুর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্র সমাজ জেগেছে', 'সংগ্রাম না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ', 'এই বাংলায় হবে না, বৈষম্যের ঠিকানা', 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার', 'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন' সহ বিভিন্ন ব্যানার, পোস্টার প্রদর্শন এবং কোটাবিরোধী এসব স্লোগান দিতে শোনা যায়।

৪ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দাবিগুলো হলো—

১. ২০১৮ সালে ঘোষিত সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ও মেধাভিত্তিক নিয়োগের পরিপত্র বহাল রাখতে হবে। পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না এবং কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলোতে মেধা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে।

২. যাদের কোটা আছে জীবদ্দশায় একবারই কোটা ব্যবহার করতে পারবে।

৩. প্রতি ১০ বছর পর পর জনশুমারির সঙ্গে অর্থনৈতিক সমীক্ষা করতে হবে যাতে আমরা বুঝতে পারি কোটার প্রয়োজনীয়তা কেমন এবং কোটার মূল্যায়ন করা।

৪. দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

আন্দোলনে আসা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থবর্ষের শিক্ষার্থী আসিফ আজাদ বলেন, বাংলাদেশে চাকরির বাজারে ৫৬ শতাংশ কোটা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ। এ কোটার কারণে অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ভেঙে যায়। আমরা চাই স্বাধীনতার এত বছর পর একটি সুন্দর ও বৈষম্যমূলক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক।

হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগের ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র অনিকেত বর্ধন আকাশ বলেন, আমাদের দাবি হচ্ছে সব ধরনের চাকরি থেকে কোটা প্রথার অবসান করা হোক। একজন মেধাবী শিক্ষার্থী কঠোর পরিশ্রম করেও চাকরি পাচ্ছে না, অপরদিকে একজন কোটাধারী অল্প নাম্বার পেয়েও চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পাচ্ছেন। যা সম্পূর্ণভাবে বৈষম্য। আমরা চাই, এ বৈষম্যের অবসান হোক।

[সূত্র: সমকাল, ৪ঠা জুলাই ২০২৪]

গ্রাফিতি-স্লোগানে প্রতিবাদ, সাম্য-অসাম্প্রদায়িক বাংলার বার্তা

যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বুকে আন্দোলনে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে গ্রাফিতি-স্লোগান-দেয়াল লিখন। যা ওই আন্দোলনের অস্তিত্বকে বহন করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। বেশ কিছুদিন আগেও দেশের আনাচে-কানাচের দেয়ালগুলো ছিল কেবলই রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের বন্দনা, তোষামোদ ও প্রচারণায় ভরপুর।

তবে হঠাৎই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন দেয়ালের রূপ-যৌবন। এতকাল আশাহীন মানুষের মতো জীর্ণশীর্ণ, বিবর্ণ, মলিন, প্রাণহীন দেয়ালগুলোও নীরবতা ভঙ্গ করে উচ্চারণ করতে লাগল ছাত্র-সমাজের অব্যক্ত কথামালায়।

এর ব্যতিক্রম নয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীরা মানুষের না বলা কথাগুলো, শোষণ-প্রতিবাদের চিত্রগুলো তারা এঁকে দিতে লাগল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন একাডেমিক ভবন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ভবনের দেয়াল আর শরীরজুড়ে। এতে সীমানা প্রাচীরগুলো হয়ে ওঠে প্রতিবাদ, সাম্য, অসাম্প্রদায়িক, বিপ্লব ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভূতপূর্ব নিদর্শন। পথচারী থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবার নজর কাড়ছে এসব মর্মস্পর্শী গ্রাফিতি।

৯ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ, চারুকলা অনুষদের তাসনিয়া মৌমি, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রিফাইয়া রাজ্জাক রিফাসহ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে 'গ্রাফিতি করবো' বলে একটা গ্রুপসহ পেইজও খোলা হয় এবং এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। তারা ১১ থেকে ১৪ই আগস্ট ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দেয়ালে গ্রাফিতি অঙ্কন করেন।

এসব গ্রাফিতিতে ছাত্র আন্দোলনে শহিদদের প্রতিকৃতি ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধার পাশাপাশি উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা, উচ্চারিত হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রে সমতার বাণী, শোষণের কথা, বাক্‌স্বাধীনতার কথা, মাথা নত না করার প্রত্যয়, বাঙালি ও পাহাড়িদের সমঅধিকার থেকে শুরু করে সব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর প্রতিরোধের অগ্নিময় উক্তি ও সাহসী চিত্রায়ণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমিক ভবনের মূল ফটকের পাশের দেয়ালেই দেখা যায়, বড়ো করে লেখা হয়েছে 'আওয়াজ উডা কথা ক' পাশেই এক তরুণ হাত-আঙ্গুল উঁচু করে চিৎকাররত ভঙ্গিমায় রয়েছে।

র‍্যাপার হান্নানের 'আওয়াজ উডা বাংলাদেশ' এই গানটি আন্দোলনের সময় তরুণদের ব্যাপকভাবে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল। এজন্য অবশ্য তাকে গ্রেপ্তার থেকে শুরু করে রিমান্ডেও নেওয়া হয়েছিল। হান্নান যখন বলে, 'আবু সাঈদরে গুল্লি করলি, অর্ডার দিলি কই থেক্কা?/ এইবার রাস্তায় হাজার সাঈদ কইলজা থাকলে ঠেকাগা!' তখন তা হাজারো তরুণের প্রতিবাদের অংশ হয়ে উঠে।

আবার আরেক গ্রাফিতিতে লেখা হয়েছে 'আমার হৃদপিণ্ডের আঘাতে বেঁকে যায় স্বৈরাচারীর বেয়নেট'– এ বাক্য দিয়ে যেন এই সময়ের তারুণ্য যে মাথা নোয়াবার নয়, সেই উদ্দীপন শক্তিকেই বুঝিয়েছে।

প্রতিবাদের পাশাপাশি দেয়ালগুলোতে শোষণের চিত্রায়ণও দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের পেছন সংলগ্ন প্রহরীর রুমের দেয়ালে 'ইন্টারনেট একা একা বন্ধ হয়ে গেছে' লেখাসহ পাশেই একজন মুজিব কোট পরিধান করা লোককে দেখতে পাওয়া। বুঝতে বাকি থাকে না যে, ১৭ই জুলাই থেকে চলমান ইন্টারনেট শাটডাউন করে শিক্ষার্থীদের দমন করার যে ষড়যন্ত্র সরকার করেছিল এখানে তার কথা বোঝানো হচ্ছে।

একইসঙ্গে এই কাজের অন্যতম সহযোগী তৎকালীন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর ডানপাশে আরেক গ্রাফিতিতে লক্ষ্য করা যায়, এক বড়ো ড্রেজারে অনেক সবুজ ঘাস-গাছ জাতীয় কিছু, সঙ্গে একটি বাড়ি; নীচেই অনেক রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এর মাঝে লেখা 'পাহাড় কেটে উন্নয়ন'।

এছাড়া পাহাড়ে বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে গুম হওয়া কল্পনা চাকমার গ্রাফিতিও স্থান পেয়েছে। এক দেয়ালে কল্পনা চাকমার চোখবাঁধা ছবির পাশে লেখা হয়েছে 'কল্পনা চাকমা কোথায়?'

ছাত্র আন্দোলনের শহিদদের প্রসঙ্গগুলোও বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেয়ালগুলোতে জায়গা পেয়েছে। রাজধানীর মিরপুরের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) শিক্ষার্থী শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের নির্মম মৃত্যুও গ্রাফিতিতে উঠে এসেছে। যার দেহটি ১৮ই জুলাই পুলিশের একটি সাঁজোয়াযানের উপর থেকে টেনে নিচে ফেলা হয়। ইয়ামিন সাঁজোয়াযানের চাকার কাছে সড়কে পড়ে থাকেন। এরপর পুলিশের এক সদস্য সাঁজোয়াযান থেকে নীচে নামেন। এক হাত ধরে তাকে টেনে আরেকটু দূরে সড়কে ফেলে রাখেন।

গ্রাফিতিটিতে দেখা যায়, সাঁজোয়াযানের উপর একটি লাশ এবং তার বুকের ভিতর থেকে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা আগুনপাখি। এমন শহিদদের আত্মত্যাগেই যে তরুণদের প্রতিবাদের অগ্নিশিখা আরও বেগবান হয় এ যেন তারই প্রতিফলন। এর পাশাপাশি বাদ যায়নি, রংপুরের আবু সাঈদ; যিনি এই আন্দোলনের প্রথম শহিদ। যদিও গ্রাফিতিতে তাকে রূপকভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

এক গ্রাফিতিতে দেখা যায়, একটি মোমবাতির অগ্নিশিখায় কেউ একজন হয়ত বুক পেতে দিচ্ছে। পাশেই আরেকটা মোমবাতির অগ্নিশিখা নিভে গেছে, কিছুটা রক্তের ছাপ সেখানে। এর ডানপাশে আবার অনেকগুলো মোমবাতির অগ্নিশিখায় অনেকে বুক পেতে দিচ্ছে। এর উপরে লেখা হয়েছে, 'আমি নয়তো একজন, আমরা অনেকজন'। আবার আন্দোলনে মুগ্ধের আমৃত্যু পানি বিলিয়ে যাওয়া বিষয়টিও উঠে এসেছে, 'পানি লাগবে পানি?'।

১লা আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা চত্বর সংলগ্ন রাস্তা থেকে সিভিল পোশাক পরিহিত কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের সামনে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে অবশ্য শিক্ষকদের সাহায্যে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। গ্রাফিতির ভাষায় বাদ পড়েনি সেই ঘটনাও।

এছাড়া দেয়ালগুলোর লেখনীতে সমতা-অসাম্প্রদায়িক চেতনাও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: একটি দেয়ালে একটি গাছের প্রতিটি পাতায় বিভিন্ন ধর্মের নাম লেখা হয়েছে এবং উপরেই লেখা 'পাতা ছিঁড়বেন না'। আবার মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সেই বিখ্যাত উক্তিও স্থান পেয়েছে দেয়ালে, 'শোনো ধর্ম আর দেশ মিলাইতে যেয়ো না, পরে ফুলের নাম কি দিবা ফাতেমা চূড়া?' পাশাপাশি আরেক গ্রাফিতিতে লেখা হয়েছে, 'সমতল থেকে পাহাড় এবারের মুক্তি সবার।'

গ্রাফিতি করা প্রসঙ্গে 'গ্রাফিতি করবো'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, ৫ই অগাস্ট স্বৈরশাসনের পতনের পর আমিসহ আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে ভাবছিলাম সারাদেশেই তো প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে গ্রাফিতি করা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়েও করা যায় কি না। পরে ৯ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের তাসনিয়া মৌমি, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রিফাইয়া রাজ্জাক রিফার সঙ্গে মিলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে 'গ্রাফিতি করবো' বলে একটা গ্রুপসহ পেইজও খোলা হয় এবং ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় আমরা ১১ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দেয়ালে সকাল-সন্ধ্যা অবধি গ্রাফিতি কার্যক্রম সম্পন্ন করি। আমাদের দলে এই মুহূর্তে মোট সদস্য প্রায় ৮০ জন।

পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত সেই অর্থে জানবে না যে, এতো বড়ো একটা গণ-অভ্যুত্থান কীভাবে সফল হয়েছে। এই আন্দোলনে যে সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল, অনেকে শহিদ হয়েছিল, স্বৈরশাসকের আচরণ কেমন ছিল সব মিলিয়ে আমরা একটা বার্তা দিতে চেয়েছি গ্রাফিতির মাধ্যমে। তাছাড়া সমতলে গণতন্ত্র ফিরে আসলেও পাহাড় এখনো যে স্বাধীন হয়নি সেই বিষয়টিও আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি।

আরেক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তাসনিয়া মৌমি বলেন, বাক্‌স্বাধীনতার অংশ হিসেবে আমরা গ্রাফিতিগুলো করেছি। এছাড়া ৫ই আগস্টের যে গণ-অভ্যুত্থান সেটা তো একদিনে হয়নি, আমরা গ্রাফিতিগুলোর মাধ্যমে সে ঘটনাপ্রবাহকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি সমসাময়িক ইস্যু নিয়েও বার্তা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রাফিতি করবো' এই দলটিতে সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছে আইন বিভাগের সানজিদা রহমান, নওরিন আক্তার, মাহদী হাসান ফাগুন, আইবিএর মেহেদী হাসান, রোকনুজ্জামান রুমন, আইসিইর মুকিত আলম, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সিদরাতুল মুনতাহা।

[সূত্র: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ই আগস্ট ২০২৪]

কোটা সংস্কার আন্দোলন

রাবি ও রুয়েটের সম্মিলিত কর্মসূচি

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদ ও কোটা সংস্কারের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে নগরীর বিহাস বাইপাস মোড় অবরোধ করেন। ১০ই জুলাই বুধবার সকাল ১১টা থেকে রাবি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে একত্রিত হতে শুরু করেন। পরে, দুপুর ১২টায় একটি মিছিল নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইনগেটে অবস্থান নেন। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে রুয়েটের শিক্ষার্থীরা এসে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন। পরবর্তীতে, তারা একসঙ্গে রাবির মেইনগেট থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিহাস বাইপাস মোড় অবরোধ করেন। দুপুর ২টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বাইপাস অবরোধ করে রাখেন।

কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন লেখা– সংবলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা 'সারা বাংলা খবর দে, কোটা পদ্ধতির কবর দে', 'দেশটা নয় পাকিস্তান, কোটার হোক অবসান', 'আদায় হবে দাবি, পথ দেখাবে রাবি', 'মেধাবীদের কান্না, আর না আর না', 'কোটা-বৈষম্য নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক', 'মেধাবীদের যাচাই করো, কোটাপদ্ধতি বাতিল করো', 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, কোটা পদ্ধতির ঠাঁই নাই', '১৮-এর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'বৈষম্যর বিরুদ্ধে লড়াই করো একসঙ্গে', 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা', 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক আমানুল্লাহ আমান বলেন, যদি সরকারি চাকরিতে এই কোটা বহাল রাখা হয়, তবে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য বহিঃশত্রুর দরকার নেই, আমরা নিজেরাই নিজেদের দেশ ধ্বংস করব আগামী ১০ বছরের মধ্যে। এই রাষ্ট্রকে বিনির্মাণে ছাত্রসমাজ রাজপথে থাকবে। কোনো রকম হুমকি, হলে তালা ঝুলিয়ে কিংবা বাইক শোডাউন দিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

কর্মসূচিতে আসা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থবর্ষের শিক্ষার্থী উর্বশী সাহা বলেন, আমরা দেখেছি আজকের রায় এক মাস পিছিয়ে দিয়েছে। আমরা তো এক মাস পিছানোর কথা বলিনি। আমরা সারাজীবনের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত কোটা সংস্কারের দাবি জানিয়েছি। আমরা চাই অনগ্রসর মানুষদের জন্য ২ শতাংশের বেশি কোটা নয় এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের জন্য আজকে সড়ক অবরোধ করেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না।

[সূত্র: সমকাল, ১০ই জুলাই ২০২৪]

কোটাবিরোধী আন্দোলন

তৃতীয় দিনের মতো রাজশাহীর রেল যোগাযোগ বন্ধ

তৃতীয়দিনের মতো ঢাকা-রাজশাহী রেল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শিক্ষার্থীরা। ১২ই জুলাই শুক্রবার বিকাল ৫টা থেকে স্টেশন বাজার সংলগ্ন রেল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ১১ই জুলাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে-সব জায়গায় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে তার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন তারা। এ বিক্ষোভ সমাবেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে অবস্থান নিয়েছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

মেডিকেল কলেজ ও রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থীরা। এর আগে, বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে বিভিন্ন হল থেকে ছোটো ছোটো মিছিল নিয়ে সমবেত হতে দেখা যায় তাদের। পরে চার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একত্রে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেললাইনে এসে অবরোধ করেন।

'আমার ভাইয়ের রক্ত কেন? প্রশাসন জবাব চাই', 'কুমিল্লায় হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই', মুক্তিযুদ্ধের মূলকথা, সুযোগের সমতা', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে', 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা', 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'- এমন সব স্লোগানে মুখর করে তুলেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থবর্ষের শিক্ষার্থী সাথী আক্তার বলেন, সরকার আমাদের নিয়ে তামাশা করছে। ৪ঠা জুলাই যে রায় হওয়ার কথা ছিল সেই রায় এখন ৭ই আগস্টে নিয়ে গেছে। সরকার চাচ্ছে আমাদের আন্দোলন ধামাচাপা দিতে। ১১ই জুলাই আমাদের যৌক্তিক দাবির আন্দোলনে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করেছে পুলিশ। আজকে আমরা অবস্থান নিয়েছি, আমাদের উপরেও হামলা হতে পারে তবুও আমরা আমাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য মাঠে থাকব।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী মারুফ বলেন, আমরা সারাদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বয় করে রেললাইন অবরোধ করেছি। প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়া সকল কোটারই যৌক্তিক সংস্কার করতে হবে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে আমার ভাইদের উপর গুলি চালিয়েছে পুলিশ। এরই প্রতিবাদে আজ আমরা ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধ করি।

রাবি শিক্ষার্থী গাজী সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, সরকার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশি হামলা চালিয়েছে। আমি বলতে চাই সরকার এমন করতে থাকলে তারা আবারও ১৯৫২ সাল দেখতে পারবে। এছাড়াও আমাদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেওয়ার এক শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর করে হল ছাড়া করা হয়েছে। কেন তাকে মারধর করা হয়েছে? অতিদ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং আমার ভাইকে দ্রুত ক্যাম্পাসে ফিরানো হোক।

[সূত্র: রাজশাহী পোস্ট.কম, ১২ই জুলাই ২০২৪]

চব্বিশেও তারুণ্যের জয়ধ্বনি

মাহমুদা টুম্পা

ইতিহাস কথা বলে। ইতিহাস কথা বলে বর্তমানের, ইতিহাস কথা বলে সুদূর ভবিষ্যতের। তবুও আমরা ইতিহাস ভুলে যাই। ভুলে যাই ছাত্রদের আত্মত্যাগের কথা, ভুলে যাই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কথা। দেশটা যখন কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত, স্বৈরশাসকের হাতে জীর্ণশীর্ণ, বৈষম্যের চাদরে যখন গোটা পৃথিবী আচ্ছন্ন ঠিক তখনই ছাত্রসমাজ গড়ে তোলে নবদিগন্ত। ছাত্রসমাজ জাতির আশা ভরসার একমাত্র কেন্দ্রস্থল, জাতীয় জীবনের যে-কোনো মুহূর্তে তারা জীবন দিতে সদা প্রস্তুত।

ইতিহাসের পাতায় ছাত্রসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সেদিন আমাদের মাতৃভাষাকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় করার ষড়যন্ত্রে বিভোর ছিল। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা সেদিন ঢাকার রাজপথে তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ গৌরবদীপ্ত দায়িত্ব পালন করেছেন, ১৯৬২ সালের অগণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা প্রণয়নে ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে সচেতন ছাত্রসমাজ রেখেছে দৃষ্টান্তযোগ্য ভূমিকা। আবার ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ স্মরণযোগ্য অবদান এবং ১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের উত্তাল দিনগুলোতে সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ব্যাপক ভূমিকা জাতি কখনো ভুলবে না।

এসব ছোটোবেলা থেকে বইয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার ছোট্ট জীবনে কখনো ছাত্র আন্দোলন দেখার সৌভাগ্য হয়নি, সৌভাগ্য হয়নি মুক্তিযুদ্ধ দেখার। তবে আমি ২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন দেখেছি। দেখেছি ছাত্ররা তাদের ন্যায্য সংগ্রামে কতটা তৎপর। 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে'– স্লোগানকে কেন্দ্র করে যাত্রার সূচনা হয়। ধীরে

তা বাংলা ব্লকেডে রূপ নেয়। ৫৬ শতাংশ কোটা সংস্কারে অনড় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা। একই ব্যানারে শাহবাগসহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শুরু হয় মিছিল। মিছিলে ছিল না সংঘাতপূর্ণ আচরণ, ছিল না লুটতরাজ। শান্তিপূর্ণ মিছিলে ছিল একটাই চাওয়া– মেধাবীদের মুক্তি দেওয়া। কিন্তু তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলো না। রাজাকার বলে গালি দেওয়া হলো। বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ আরও বেশি সক্রিয় হলো আন্দোলনে। কিন্তু শাসকশ্রেণি সমাজ এটি মেনে নিলেন না। শুরু করল অমানবিক নির্যাতন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সরকারের নির্দেশে চালিত পুলিশ বাহিনী।

হল বন্ধ করে দেওয়া হলো। শাসকশ্রেণির ডানহাত ছাত্রলীগও সাধারণ জীবনযাত্রাকে নরকক্ষেত্রে পরিণত করল। একে একে শহিদ হতে লাগল নিরপরাধ প্রাণ। রক্তাক্ত শিক্ষার্থীরা লাশ হয়ে ফিরল। মিছিলে ঝরে গেল আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, ছোট্ট রিয়া, আসিফ, ওয়াসিম, সুমাইয়া, দীপ্ত, সিয়াম, জিল্লুর, সাজ্জাদ, মেহেদী, দুলাল, ইমরান, রাকিব, তোরাব, রুদ্র, সেলিম, রাসেলসহ নাম না জানা আরও অনেকের নিষ্পাপ প্রাণ। মৃত্যুর শোক আন্দোলনকে আরো দ্বিগুণ করল। জেলায় জেলায় মিছিল তীব্র হতে লাগল। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিতেই থাকল। ৯ দফা দাবি সূচনা করলো 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি। কর্মসূচিতে আসা শিক্ষার্থীদের নির্যাতন চালানো হলো। শুরু হলো সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়া। ছাত্রদের ওপর বল প্রয়োগ করা হলো। ঢাকা, খুলনা, বগুড়া, কুমিল্লায় আবারও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকল। ছাত্রদের লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ছড়িয়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করল। সফল না হতে পেরে গুলি করল। ছাত্রদের রক্ত পিচঢালা রাজপথে মিশে গেল। মিছিল থেকে গণহারে শিক্ষার্থীদের তুলে নেওয়া হলো জেলখানায়।

কত নিষ্পাপ ছাত্রদের পিটুনি দেওয়া হলো, গুলি করা হলো শুধুমাত্র শিক্ষার্থী হওয়ায়। পুলিশি আক্রমণে সবচেয়ে বেশি নিহত হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। সরকার ৩০শে জুলাই শোকের দিন ধার্য করেছিল। জাতির কালো ব্যাচ ধারণ করার কথা ছিল সেদিনে। কিন্তু প্রতিবাদী ছাত্রসমাজের সবাই লাল প্রোফাইল পিকচার আপলোড দিলো ফেসবুকে। অনলাইনেও চলে ব্যাপক প্রতিবাদ সভা। দিগ্‌বিদিক আন্দোলনে শামিল শিক্ষকদের পুলিশ ছাড়ল না, তাদেরকেও ধরে নিয়ে গেল জেলখানায়। কত অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে তাদের শুধুমাত্র ন্যায্য দাবির পাশে থাকার সমর্থনে পুরো ৩৬ দিন ধরে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে গেছে শিক্ষার্থীরা। মৃত্যুভয়, আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কখন জানি প্রাণটা চলে যায়। তবে অন্ধকার পেরিয়ে প্রভাতফেরির আলোক রেখা দেখা দিলো। ৫ই আগস্ট স্বৈরশাসকের পতন হলো। 'লং মার্চ টু ঢাকা' অ্যাটাক কর্মসূচি সফল হলো। পরিস্থিতির ধকল সহ্য না করতে পেরে স্বৈরাচার শাসক নিজেই পদত্যাগ করলেন। ৫ই আগস্ট দ্বিতীয় স্বাধীনতার দিন উপহার দিলো ছাত্রসমাজ। আন্দোলনে বেওয়ারিশ অনেক লাশ দাফন করা হয়েছে। এর মধ্যেই শুরু হয়েছিল ইন্টারনেট বন্ধের নাটক। না জানি এ সময় কত মানুষের প্রাণ চলে গেছে তা সরকারি খাতায় আসবে না। আসবে না ফিরে মায়ের বুকের ধন বেগম রোকেয়ায় মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। যিনি কোটা যুদ্ধে প্রথম শহিদ হয়েছিলেন। আসবে না ফিরে শত শত প্রাণ যারা মৃত্তিকায় মিশে আছে বুলেটের আঘাতে। ফিরে আসবে না আর বেওয়ারিশ লাশ, যার জন্য হয়ত এখনো মা বাবা পথ চেয়ে বসে আছে। যার জন্য এখনো তারা অপেক্ষা করছে। ফিরে আসবে না ছোট্ট রিয়া, ফিরে আসবে না আলোকিত বাংলায় মেধাবীদের প্রিয় মুখ।

আমাদের ছাত্রসমাজের অতীত অতি গৌরবদীপ্ত। জাতির সংকটকালীন বিভিন্ন সময়ে তারা যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে তা অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য। সেই অনুকরণের ধারায় ২০২৪ সাল হয়ে ওঠে ভয়াবহ ছাত্র আন্দোলনে। একটা কোটা সংস্কার আন্দোলন রূপ দেয় রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনে। অসহযোগ আন্দোলনে আজ বাংলা আবারও মুক্তি পেল। মুক্তি পেল জাতি। ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনও ব্যাপক ভূমিকা

ছিল ছাত্রদের। সেখানেও সফল ছিল শিক্ষার্থীরা। বারে বারে সাফল্যের ধারাবাহিকতা এভাবেই ছিনিয়ে আনে তরুণসমাজ।

আপদকালীন মুহূর্তে ছাত্রসমাজ অগ্রণী এবং সাহসী ভূমিকা পালন করেছে তা পুরোদমে অনুধাবন করলাম ২০২৪ সালে। আমাদের ৬ সমন্বয়ক নাহিদ

ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আবদুল্লাহ, নুসরাত তাবাসসুম, আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার যেন তারুণ্যে উজ্জ্বল দীপ্তি। তাদের যখন ধরে নিয়ে জোরপূর্বক দাবি তুলে নেওয়ার বিবৃতি দেওয়া হলো ঠিক তখনই চতুর শিক্ষার্থীরা বিকল্প সমন্বয়ক তৈরি করল। সব ষড়যন্ত্রকে তুচ্ছ করে আন্দোলনের বেগ বাড়াতে লাগল। ভয়াল আন্দোলনের তোপে পড়ে ৬ সমন্বয়কে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়করাও, ভবিষ্যতের কাণ্ডারি, নবশক্তির উদ্ভাবক। নবশক্তির উদ্ভাবকরা স্বৈরশাসকের পতন ঘটাননি, সূচনা করেছে নতুন বাংলা। গণভবন থেকে নিয়ে আসা সবকিছু ফেরত দেওয়া হয়েছে তাদের আহ্বানে। নিষ্ঠা ও যত্নের সাথে জাতীয় সংসদসহ রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। গাছ লাগানো, দেয়ালে রং করা থেকে ট্রাফিক পুলিশের কাজ দক্ষতার সাথে সুসম্পন্ন করেছে। বাজার মনিটরিংও করেছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে মুসলিমরা মন্দির পাহারা দিচ্ছে। ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচতে টিম করে কাজ করছে। শহিদ ভাইদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অভিভাবকহীন অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলার গুরু দায়িত্ব দিয়েছে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে। চেষ্টা করেই যাচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশকে যেন সবসময় দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে। কাজ করেই যাচ্ছে কোনো দুষ্টচক্রের রাজনৈতিক হাতিয়ার যেন বাংলাদেশ আর না হয়। এমনকি পুরানো সব রেকর্ড ভেঙে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হয়েছে তরুণ সমাজের নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বর্তমানের জেড জেনারেশন নাকি ফেসবুক, টিকটকের ভিডিওতে মগ্ন। তারা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। মুরুব্বিদের ধারণা এ ছাত্রসমাজ একটু বিপদে হটিয়ে যাবে, দৌড়ে পালাবে দেশ থেকে। এরা নাকি দেশকে ভালোবাসে না। কিন্তু কী হলো অবশেষে। সর্বপ্রথম আন্দোলনে ছিল ছাত্ররা। যে ছাত্রসমাজ ন্যায্য দাবির আন্দোলনে শিক্ষকদের ঘুম ভাঙায় সে জেনারেশন নষ্ট হয়নি। জ্ঞানশক্তি ও তারুণ্যশক্তির সমন্বয়ে এ জাতিও দেশমাতৃকাকে বাঁচাতে সদা প্রস্তুত।

চব্বিশেও তারুণ্যের জয়ধ্বনি। আরও একবার বিজয় আনল তরুণ সমাজ। যা পারেনি বিপক্ষের কোনো রাজনৈতিক দল। ইতিহাসের বিভীষিকাময় ক্রান্তিলগ্নে মহাবিপ্লবের শামিল সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ২০২৪ সাল এই শিক্ষাই দেয় ছাত্ররা কখনো পিছুপা হটে না, ছাত্ররা রাজপথে মহাজাগরণের বিপ্লবে মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে– নতুন স্বপ্নজুড়ে দেয় জাতির ভাগ্যাকাশে।

মাহমুদা টুম্পা: শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

[সূত্র: দৈনিক করতোয়া, ১৫ই আগস্ট ২০২৪]

ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ রাবি শিক্ষার্থীদের

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের অবমাননা করা হয়েছে এমন দাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ১৪ই জুলাই রবিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টায় বিক্ষোভকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক ভেঙে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা– 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার', 'চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার'– ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করেন। এর আগে রোববার রাত ১১টা থেকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন হল থেকে ছোটো ছোটো মিছিল নিয়ে বের হতে থাকেন। পরে তারা মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে একত্রিত হন। এরপর শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিতে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের দিকে আগাতে থাকেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক বন্ধ থাকায়, শিক্ষার্থীরা তা ভেঙে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে অবস্থান নেন এবং মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।

[সূত্র: সমকাল, ১৫ই জুলাই ২০২৪]

ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ কোটা আন্দোলনকারীদের

কোটা সংস্কারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে গিয়ে ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

জানা গেছে, বিক্ষোভ না করতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নির্দেশ উপেক্ষা করে বিকেল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চত্বরে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। পরে ক্যাম্পাস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ের মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এতে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছাড়াও জেলার অন্যান্য কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে দেখা যায়। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সড়ক অবরোধ তুলে নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে যান শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়। কিন্তু নানা মাধ্যমে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ না করার হুমকি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নেতারা। কিন্তু শত শত শিক্ষার্থী সেই হুমকি উপেক্ষা করেই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

[সূত্র: সমকাল, ১৬ই জুলাই ২০২৪]

কোটা সংস্কার আন্দোলন ও রক্তাক্ত প্রান্তর

অ্যাড. মো. মোজাম্মেল হক

বেশ কিছুদিন যাবৎ সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন ও সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটে চলছে। একজন আইনজীবী হিসেবে এই বিষয় নিয়ে কোনো কলাম লিখিনি, কারণ বিষয়টি ছিল সাবজুডিস। একটু খোলাসা করে বলাই ভালো, যারা বিজ্ঞ আইনজীবী কিংবা আইনের ছাত্র এবং বিজ্ঞ বিচারক এবং জ্ঞানীজন তারা সাবজুডিস শব্দের অর্থ ভালো করেই জানেন আর যারা সাবজুডিস শব্দের সঙ্গে পরিচিত নন বিনয়ের সঙ্গে

তাদের জন্য বলি, যে বিষয় নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন সেই বিষয়টিই সাবজুডিস। কোটা সংস্কার বিষয় নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা ছিল আর সেই জন্যে সাবজুডিস বিষয় নিয়ে কথা না বলাই ভালো মনে করেছি কিন্তু ইতোমধ্যেই কোটা সংস্কার নিয়ে করা মামলায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিলেট ডিভিশন রায় প্রদান করেছেন। রায়ের ফলাফল পত্রিকা এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা অনেকেই অবগত হতে পেরেছি। ইতোমধ্যেই পদ্মা মেঘনা যমুনার জল অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। বহু হতাহত হয়েছে। *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকার খবর অনুযায়ী এই আন্দোলনে ২১শে জুলাই পর্যন্ত মাত্র পাঁচদিনেই নিহতের সংখ্যা ১৭০ জন। অনেকে দাবি করেন নিহতের প্রকৃত সংখ্যা ২০০ জন ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে একটি ইস্যু নিয়ে মাত্র কয়দিনে এত সংখ্যক তরতাজা প্রাণ আর কখনই ঝরেনি, কিন্তু এ দায় কার, কে নিবে এই অকালমৃত্যুর দায়িত্ব। দায়তো কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। আজ হয়ত সবলের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে না কিন্তু ইতিহাসে তো ঠিকই লেখা হবে। ইতিহাসের প্রবহমান নদী আপন গতিতেই চলে, কেউ তারে রুখতে পারে না, ফলে একদিন সঠিক ইতিহাসই রচিত হবে। এক সময় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ঐতিহাসিকগণ ঠিকই তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন করেছেন, আসলে এ কথাই ঠিক ইতিহাসের চরম শিক্ষা হচ্ছে ইতিহাস থেকে আমরা কেউ শিক্ষা নেই না। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে আসাদকে গুলি করে হত্যার কারণে জালিমশাহীর ক্ষমতার ভীত কেঁপে উঠে, যার নিষ্পত্তি হয় ৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। সেদিন যদি জালিমশাহী ক্ষমতার দম্ভ না দেখিয়ে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসত তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হতো। রাজনীতিতে দাম্ভিকতা একটি খারাপ কালচার। জ্ঞান থাকা যেমন ভালো তেমনি জ্ঞানের অহমিকা থাকা

ভালো নয়। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের জায়গা থেকে বিষয়টি তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাবে বলার কারণে আজকে এই অবস্থা। আর এবারের এই ইস্যু কোটা সংস্কারের বল সরকারের কোর্টেই ছিল, সরকারই সেই বল আন্দোলনকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে।

বাংলাদেশের যতগুলো গর্বের বিষয় আছে তার মধ্যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম অন্যতম। স্বাধীনতার বীর সেনানীরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বহু যুদ্ধ আসবে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে, অশিক্ষা-কুশিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আসবে, আরও নতুন নতুন যুদ্ধ আসবে কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধ আর এদেশে কোনোদিনই আসবে না, সুতরাং স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর সেনানীরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের গর্বের ইতিহাস, আমাদের অহংকার, আমাদের সম্মানের পাত্র, তাঁদেরকে আমরা সম্মান করি। তাঁদের বংশধরদেরও আমরা সম্মান করি এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখি। খুব কাঁচা বয়সে ওপার বাংলার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্যের একটি উপন্যাস পড়েছিলাম যার নাম ছিল *মেমসাহেব*, সেখানে বাচ্চু নামে একটি চরিত্র ছিল। লেখক উদাহরণ দিতে গিয়ে বাচ্চুকে দিয়ে একটি কথা বলিয়েছেন, যেদিন থেকে তোমাকে (অর্থাৎ লেখককে) ভালোবেসেছি সেদিন থেকে দোলা বৌদিকেও (লেখকের প্রিয়তমা) ভালোবেসেছি। আমরাও ঠিক তাই, যখন থেকে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি সেদিন থেকে তাদের পরিবারগুলোকেও আমরা সম্মান করতে শিখেছি, তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা যারা স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করেছি তাঁরা মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে সব সময়ই সম্মানের চোখে দেখে থাকি কারণ বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে সেদিন যুদ্ধ করেছিল বলেই আজ আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড ও একটি লাল-সবুজ পতাকা পেয়েছি। তাই বলে তাঁদের মেধাহীন নাতি-পুতিদের কোটার বিষয় নিয়েও ভাবার সময় ছিল। আমি বহু বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলে দেখেছি তাঁরা বলেছেন আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ের জন্যে যুদ্ধ করিনি, আমরা যুদ্ধ করেছি দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার জন্যে।

অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাই বলেছেন- দেশ স্বাধীন হবে, আমরা বেঁচে থাকব, আমরা ভাতা পাবো, আমাদের পরিবারের সন্তানেরা সরকারি চাকরি পাবে– এ আশায় আমরা যুদ্ধ করিনি। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা তাঁরা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেয়নি। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে রিকশা চালিয়ে জীবন বাঁচাতে দেখেছি, তাঁরা সরকারি ভাতার জন্য কাউকে একটি কথাও বলেননি। আমি স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় হাইস্কুলের ছাত্র ছিলাম, ছোটো থাকার কারণে যুদ্ধে যেতে পারিনি কিন্তু আমিতো দেখেছি গুটিকয়েক রাজাকার আলবদর ছাড়া বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সেই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। আজ রাজাকারদের যদি সঠিক তালিকা থাকত। তাহলে কে রাজাকার আর কে দেশপ্রেমিক তা নিয়ে এত বিতর্ক হতো না। যুদ্ধকালীন সময় যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একমুঠো ভাত দিয়েছে কিংবা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের থাকার একটু আশ্রয় দিয়েছে সেও একজন দেশপ্রেমিক,

সেও মুক্তিযুদ্ধের একজন অংশীদার। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি যারা কোনোদিন যুদ্ধ করেনি, তারাই আজ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। সে দুঃখ করে আরও বলল, মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে খাঁটি রাজাকাররাই অনেকে এখন দেশপ্রেমিক সেজেছে। একটি কথা মনে পড়ে গেল, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আ.)-কে জালিম শাসক নমরুদ যখন অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষেপ করে তখন ছোট্ট একটি ব্যাঙ সেই অগ্নিকাণ্ডের দিকে প্রস্রাব করে দেয়। ব্যাঙকে তখন সবাই জিজ্ঞেস করে তোমার এই প্রস্রাবে কি নমরুদের আগুনের কুণ্ড নিভবে? প্রতিবাদী ব্যাঙ সেদিন বলেছিল আমি এই জন্যে নমরুদের আগুনের কুণ্ডলীর দিকে প্রস্রাব করে দিলাম যে রোজ কিয়ামতে যেন আল্লাহ আমাকে বলতে না পারে আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিনি, বরং আমি বলব হে আল্লাহ আমি আমার সাধ্য দিয়ে নমরুদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি, ঠিক তেমনি আমরা যারা সরাসরি যুদ্ধ করতে পারিনি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে দেশমাতৃকার জন্যে কিঞ্চিত হলেও অবদান রেখেছি, আমাদের সবার অবদানটাকেও খাটো করে দেখার কোনো কারণ নাই। এবার আসল কথায় আসি, আমার যদি ভুল, হয় তাহলে ১৯৭২ সনে রচিত সংবিধানে মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যদের জন্য ৩০% কোটার ব্যবস্থা ছিল, ২০% ছিল মেধার ভিত্তিতে, জেলার কোটা ছিল ৪০%, ১০% ছিল যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর কোটা। এখন থেকে প্রায় ৫৩ বছর আগে রচিত এই সংবিধান তখনকার বাঘা বাঘা আইনজীবী ও ঝানু ঝানু রাজনীতিবিদ এই সংবিধান তৈয়ার করেছিলেন।

আমার জানা মতে সংবিধান এখন পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধন হয়েছে। সেই সময়কার সংবিধান সময় উপযোগী এবং সঠিক ও চমৎকার একটি সংবিধান ছিল। পরবর্তীতে তা সংশোধন হয়। মানুষের জন্য সংবিধান, সংবিধানের জন্য মানুষ নয়। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করতে পারত। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০% কোটা ছিল এখন সে কোটার যৌক্তিক সংস্কার হতেই পারে, এতে অশুদ্ধ হতো না, মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁর সন্তানরা এই সুযোগ দীর্ঘদিন পেয়েই এসেছে কিন্তু তাঁর নাতি-পুতি বংশ পরম্পরায়ে এই সুবিধা পাওয়া কতখানি যুক্তিসংগত এই প্রশ্নই ছিল ছাত্রদের আন্দোলনের প্রধান ইস্যু। ত্রিশ লক্ষ শহিদের পরিবার কি পেয়েছে সেটাও আজকে দেখা উচিত । নবাব সিরাজদ্দৌলার ১৭তম বংশধর এখনও বেঁচে আছে তাঁরা সরকারি কোনো সুবিধা চায় না, তাঁরা চায় শুধু সম্মান। এক সময় কোটার বিরুদ্ধে মেধা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের কারণে সরকার একটি পরিপত্র জারি করে বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কোটা পদ্ধতি বাতিল করেন, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধার

কয়েকজন সন্তান মহামান্য হাইকোর্টে একটি রিট করেন। সেই রিটে সরকারের সেই সিদ্ধান্ত তথা পরিপত্র বাতিল করে দেন এবং মহামান্য হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ এ মত ফাইন্ডিং দেন যে, সরকার ইচ্ছে করলে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করতে পারেন। সরকার সেদিকে মনোনিবেশ না করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বক্তব্য দেন এবং এই আন্দোলন প্রতিহত করবেন বলে হুমকি দেন। শুধু তাই নহে, সরকার ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেন। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলো এক হয়ে তাদের আন্দোলন শুরু করেন। তখন যদি আন্দোলনকারী ছাত্রদের সঙ্গে বসে বিষয়টি সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করত তাহলে আজকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না। নিরীহ কিছু প্রাণ অকালে ঝরে যেত না। অপরাধ বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি অপরাধীরা অপরাধ করে যাবে, মনের অজান্তে কিছু না কিছু ভুল করে যাবে যেটা দ্বারা তদন্তকারী সংস্থা ঠিকই উদ্ধার করবে প্রকৃত ঘটনা কে বা কারা ঘটিয়েছে। সরকারও মনে হয় মনের অজান্তে ভুল করেছে, যার জন্যে আজকে এই দুঃখজনক ঘটনা। ছোটো বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই।

আজ যে সকল পরিবার তাদের সন্তানকে হারিয়েছে তারাই বোঝে তাদের কত বড়ো ক্ষতিটা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা শুধুমাত্র কোটা সংস্কার চেয়েছিল, তারাতো কোটা ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার দাবি করে নাই। তারা মেধার মূল্যায়ন চেয়েছিল, তারা সংবিধানের আলোকে তাদের দাবির কথা বলেছিল সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তারা সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতার দাবি তুলেছিল। তাদের দাবিতো অযৌক্তিক ছিল না বরং সংবিধান সম্মতই ছিল, কিন্তু ঐ যে অহমিকা, আন্দোলনকারীদের আন্ডার এস্টিমেট করা, ফলে দেশে রক্তাক্ত অধ্যায়ের ইতিহাস রচিত হলো। আজকের এই আন্দোলন শুধু একদিনের ক্ষোভ থেকে নহে, অধিকার বঞ্চিতদের দীর্ঘদিনের আর্তনাদ থেকে এই আন্দোলন। কবি ঠিকই বলেছেন, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'। তবুও শেষ রক্ষা উচ্চ আদালত যৌক্তিক একটি সমাধান দিয়েছেন।

অ্যাড. মো. মোজাম্মেল হক: সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া জেলা অ্যাডভোকেটস বার সমিতি
[সূত্র: দৈনিক করতোয়া, ২৩শে জুলাই ২০২৪]

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টের অধীনে বিচার কার্যক্রমের তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠন

International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-Gi Section 8(1)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত Act-এর Section 3-এ বর্ণিত অপরাধসমূহের তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশে গঠিত তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠন করা হয়েছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক-৫ শাখা থেকে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠন করা হয়েছে।

১০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে পুনর্গঠিত তদন্ত সংস্থার সদস্যরা হলেন– বাংলাদেশ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল ডিআইজি মো. মাজহারুল হক, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মুহম্মদ শহিদুল্যাহ চৌধুরী, এন্টি টেররিজম ইউনিটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আলমগীর, পিবিআই হেডকোয়ার্টার্স ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহা. মনিরুল ইসলাম, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জানে আলম খান, ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুল ঢাকার সহকারী পুলিশ সুপার সৈয়দ আব্দুর রউফ, সিআইডি ঢাকা মেট্রোর পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. ইউনুছ, রাজশাহীর চারঘাট মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মাসুদ পারভেজ, আরআরএফ ঢাকার পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মুহাম্মদ আলমগীর সরকার এবং সিআইডি ঢাকা মেট্রো (উত্তর)-এর পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মশিউর রহমান।

তদন্ত সংস্থার কর্মপরিধি সম্পর্কে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তাগণ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টের অধীনে পরিচালিত বিচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তদন্তকার্য সম্পাদন ও ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনকে সহায়তা প্রদান করবেন।'

প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, 'তদন্ত সংস্থায় উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকবেন। প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক তদন্ত সংস্থায় কর্মরত থাকবেন।'

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

জয়পুরহাটে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া

জয়পুরহাট শহরে কোটা সংস্কারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় ইট-পাটকেল নিক্ষেপে ৬ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শহরে দুই প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সকাল ১০টার দিকে শহরের রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে কয়েকশো সাধারণ শিক্ষার্থী জড়ো হয়। তারা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সড়কে নেমে বিক্ষোভ করে। পরে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা পুলিশ সুপার কার্যালয় মোড় এলাকার সড়কে গিয়ে অবস্থান নেন। এ সময় পুলিশ রামদেও বাজলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রসর হতে বাধা দেয়। পরে ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষার্থীরা শহরের জিরো পয়েন্ট পাঁচুর মোড় অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা শহরের ডা. আবুল কাশেম ময়দানের কাছে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। এ সময় শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় আবারও পুলিশ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ধাওয়া করলে তখন শিক্ষার্থীরাও পাল্টা ধাওয়া দেয়। প্রায় আধা ঘন্টার ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও পুলিশ আহত হয়। পরে শহরের বাটার মোড়ে দুই প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। দুপুর দুইটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে বিজিবি সদস্যরা চলে যান। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

কোটা আন্দোলনে অংশ নেওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, কমপ্লিট শার্টডাউন কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জে অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজপথ ছাড়বে না।

জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে তিনিসহ ছয়জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। পুলিশ ধৈর্য্য সহকারে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। দুপুর পর্যন্ত শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

[সূত্র: সমকাল, ১৮ই জুলাই ২০২৪]

আবু সাঈদ ঘরে ঘরে

এ মুহূর্তে আমি আবু সাঈদকে স্মরণ করছি, যার ছবি প্রত্যেক বাংলাদেশির স্মৃতিতে খোদাই করা আছে। কেউ এটি ভুলতে পারে না। কী অবিশ্বাস্য সাহসী যুবক ছিলেন তিনি। তিনি বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং তার পর থেকে আন্দোলনরত তরুণ-তরুণীরা হার মানেনি। সামনে এগিয়ে গেছে এবং বলেছে, যত গুলি মারতে পারো মারো, আমরা এখানে আছি। রংপুরের পীরগঞ্জের জাফর পাড়ার আবু সাঈদের বাড়িতে গিয়ে এসব কথা বলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে গত ১৬ই জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, আবু সাঈদ যে স্বপ্নের জন্য বুক পেতে দিয়েছিল তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের। এটা গোটা জাতির কর্তব্য। আবু সাঈদের জন্য আমরা যে নতুন বাংলাদেশ পেলাম সেটি গড়ার দায়িত্ব আমাদের। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান প্রফেসর ইউনূস বলেছেন, আজকের বাংলাদেশ আবু সাঈদের বাংলাদেশ। তিনি কারও একার নন, গোটা দেশের। ঘরে ঘরে লাখো আবু সাঈদ জন্মাবে। তবে আর কাউকে যেন এভাবে প্রাণ দিতে না হয়। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সরকারের পতন হয়েছে। এ গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট বাংলাদেশে নতুনভাবে বিজয় অর্জিত হয়েছে। চলতি বছরের ১লা জুলাই থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে উদ্দেশ্য করে রাজপথে নামে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ আন্দোলনটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সারাদেশে ব্যাপকতা লাভ করে। এটি ছিল সম্পূর্ণ একটি অরাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলন। শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের দাবি থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্ট গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয় এবং স্বৈরাচারী সরকার পতনের মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করে। সেনাবাহিনী প্রধানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা এবং শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের খবর পাওয়ামাত্র সোমবার দুপুর থেকে পথে পথে শুরু হয় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের বিজয়োল্লাস। সরকারের পতনের পর সারাদেশে পথে পথে সাধারণ মানুষ বিজয়োল্লাসে নেমে পড়ে। এ সুযোগে এক শ্রেণির বিশৃঙ্খলাকারী কিছু সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামোয় অগ্নিসংযোগ করে, লুটতরাজ করে যদিও তা অল্পসময়েই থেমে যায়। কারণ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা দ্রুত এই সব বিশৃঙ্খলাকারীদের হটিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তখন দেশে অন্তর্বর্তী সরকার ছিল না, থানায় পুলিশ ছিল না, প্রশাসনে সরকারি কর্তাব্যক্তিগণ ছিলেন না। ফলে দেশে মারাত্মক একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখন বিশ্বখ্যাত নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে দেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। পুলিশ থানায় ফিরেছে, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী স্ব-স্ব কর্মস্থলে ফিরেছেন। আবার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। রাস্তায় শিক্ষার্থীরা এখন দেশ সংস্কার কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছেন। সুশৃঙ্খলভাবে ট্রাফিক পরিচালনা, রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরা, ডিভাইডারগুলোতে নতুন করে বৃক্ষরোপণ– সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। এক নদী রক্ত পেরিয়ে দেশ আবারও স্বাধীন হয়েছে। রক্তের এই ঋণ শোধ করতে হবে। বিগত আঠারো বছরে শোষণ বঞ্চনার যে পাহাড় তৈরি হয়েছে। সেদিকে নজর দিতে হবে। ছাত্রসমাজের দাবিগুলো পূরণের ব্যাপারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। রাষ্ট্র মেরামতের যে কথা বার বার বলা হচ্ছে, সেটা যেন অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশে শান্তি ফেরাতে সবাই অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করুন। প্রতিহিংসা ও সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে হবে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক দেশ গড়ায় প্রত্যেককে মনোযোগ দিতে হবে, অবদান রাখতে হবে।

[সূত্র: সম্পাদকীয়, দৈনিক করতোয়া, ১৩ই আগস্ট ২০২৪]

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

পূর্বঘোষিত ৯ দফাসহ আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ২রা আগস্ট শুক্রবার বিকেলে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। শান্তিমোড় থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি

শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে আরামবাগে শেষ হয়। এ সময় পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা পরিবর্তন করে মিছিলটি দিক পরিবর্তন করতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয় শিক্ষার্থীদের। পরে পূর্বনির্ধারিত রুট ধরে আরামবাগে পৌঁছে এবং সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়। এ সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে যোগ দেয় শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল হয়ে পড়ে বৃষ্টিস্নাত রাজপথ। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে দেখা যায়।

বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে চাঁপাই-সোনামসজিদ মহাসড়কের আরামবাগ এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আটকা পড়ে সোনামসজিদ থেকে ছেড়ে আসা শত শত পণ্যবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সোহান জানান, ইন্টারনেট বন্ধ করে সব যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া হলেও তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে।

[সূত্র: সমকাল, ২রা আগস্ট ২০২৪]

কোটা না, মেধা হোক যোগ্যতা

মোহাম্মদ নজাবত আলী

আবার কোটা নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিগত ২০১৮ সালে কোটা বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থী-চাকরি প্রত্যাশীরা আন্দোলন শুরু করে। সে সময় আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে কোটা বাতিল ঘোষণা করেন। সাধারণত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে তাদের অধিকাংশ অভিভাবকই চান তাদের সন্তানরা শিক্ষাজীবন অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে অবশ্যই একটি ভালো সরকারি চাকরি পাবে এবং অবশিষ্ট জীবন সুখে শান্তিতে কাটাবে। এ ধরনের প্রত্যাশা অভিভাবকের রয়েছে। কিন্তু কোটা ব্যবস্থার কারণে অনেক সময় মেধাবীরাই সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষকে মানবিক করার পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের পথ তৈরি করে।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থেকে দেশ ও জাতির সেবা করার সুযোগ পায়। তাই সেসব রাষ্ট্রগুলোতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী এক ধরনের পরীক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকার ফলে বেকারত্ব কম।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার ৫৩ বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে দেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, গবেষণাধর্মী উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নেই বললেই চলে।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবছর যে হারে শিক্ষার্থীরা বের হয়ে আসছে, সে হারে কর্মসংস্থান হচ্ছে না। ফলে আমাদের দেশে বেকার সমস্যার কার্যকর কোনো সমাধানও হচ্ছে না। এর মূল কারণ বর্তমান আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও কোটা পদ্ধতি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা না পারছে একজন শিক্ষার্থীকে মানবিক করে তুলতে না পারছে বেকারত্বের অবসান ঘটাতে।

প্রতিবছর হাজার হাজার বেকারের জন্ম দিচ্ছে বেকারদের বোবা কান্না তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের মতো অনেক অভিভাবকদের অবশ্যই ব্যথিত করে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শিক্ষার অর্থ আত্মকর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃত শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, বেকারত্ব থাকা। বেকার জীবন মানেই অভিশপ্ত জীবন তবুও শ্রম বাজার ও চাকরির বাজারে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে যা সব পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়।

গত কয়েকদিন ধরেই শিক্ষার্থী-চাকরি প্রত্যাশীদের কোটাবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান সারাদেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। পুরো বাংলাদেশে অবরোধ কর্মসূচি চলছে। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী ও চাকরি

প্রত্যাশীদের দাবি সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে ২০১৮ সালের সরকারের পরিকল্পনা পুনর্বহাল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী বলেন কোটা থাকবে না। সেই কোটা আজ কোথা থেকে এল।

তিনি ছাত্রদের সাথে প্রহসন করেছেন বলেও অভিযোগ করেন। ক্রমান্বয়ে এ আন্দোলন বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা ক্লাস, পরীক্ষা বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসে। সরকার কেন যে এ আন্দোলনে গুরুত্ব দিচ্ছে না তা আমাদের বোধগম্য নয়। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোটাবিরোধী আন্দোলন অযৌক্তিক। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারি না। ভালো কথা।

আদালতের সব রায় কি মানা হচ্ছে? অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসর ভাতা ৬ মাসের মধ্যে প্রদান করার যে রায় অতিসম্প্রতি আদালত দিয়েছে তা কি সরকার মানছে? সরকার ইচ্ছে করলে সবকিছুই করতে পারে। একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে কোটা সংস্কার করতে পারে। ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের তুমুল আন্দোলনের মুখে কোটা প্রথা বাতিল করা হয় (৪ঠা অক্টোবর)- এর ফলে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল হয়ে যায়।

সম্প্রতি হাইকোর্টের একটি রায়ে কোটা প্রথা বহাল হওয়ায় আবার নতুন করে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। হবে না-ই বা কেন। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তার ওপর কোটা পদ্ধতি গোদের ওপর বিষফোঁড়া। বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থায় প্রকৃত মেধাবীরা হতাশ। কোটার কারণে অযোগ্য দুর্বল মেধাসম্পন্ন চাকরি প্রার্থীরা অধিকাংশ সময় চাকরি পান আর প্রকৃত মেধাবীদের অনেকেই চাকরি থেকে বঞ্চিত হয় এমন অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে রয়েছে।

এমনিতে দেশে চরম বেকার সমস্যা। অধিকাংশ বেকারদের কোনো কর্মসংস্থান নেই। এ কারণে শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত ও চাকরি প্রার্থীরা রেলপথ, সড়কপথ অবরোধ করে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি পালন করছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এদিকে গত ১০ই জুলাই ২০২৪ বুধবার কোটা বহাল রেখে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের উপর একমাসের স্থিতাবস্থা দেয় আপিল বিভাগ। এর ফলে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

একটা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, মানুষের জীবনযাত্রার মানের ওপর নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। তবে দারিদ্র্যের হার অনেক কমলেও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে এখনো পৌঁছেনি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে, বাড়ছে পাসের হার প্রায় শতভাগ বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বলা যেতে পারে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জন একেবারে কম নয় বরং চোখে পড়ার মতো।

শিক্ষাক্ষেত্রে এ অর্জন বলতে বোঝাতে চাচ্ছি পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, জীবনযাত্রার মানও উন্নয়ন ঘটেছে। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের এক কথায় বলা যেতে পারে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের মূল কারিগর হচ্ছে দক্ষ মানবসম্পদ।

জনসংখ্যা একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক নয়, যদি বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। কেননা শিক্ষা ছাড়া কোনো দেশ টেকসই উন্নয়নের পথে যেতে পারে না। আর শিক্ষা ছাড়া কখনই দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হতে পারে না। এজন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলো কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি সে রাষ্ট্রকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে আত্মকর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে সে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কারিগরি কর্মমুখী শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একটি গণমুখী উন্নত মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে দেশকে দ্রুত টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়। উপরন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। তাই প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণমুখী বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকৃত মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিচ্ছে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে তাদের একটি বড়ো অংশ বেকার থেকে যাচ্ছে।

বেকারত্ব কতটা ভয়াবহ তা সহজে অনুমেয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। সরকারি পদ শূন্য হওয়ার সাথে উক্ত পদে যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগ দিয়ে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাবে। প্রতিবছর যেভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে সেভাবে নিয়োগ দেওয়া কিন্তু হচ্ছে না। অথচ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদ রয়েছে।

এ শূন্যপদগুলো দ্রুত পূরণ করতে না পারলে বেকারের সংখ্যা আরও ভয়াবহভাবে বেড়ে যাবে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। আর সরকারি চাকরিতে কোটা থাকায় প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছে। যার কারণে কোটা সংস্কারের আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছেন শিক্ষার্থী-চাকরি প্রত্যাশীরা।

কোটা সংস্কারের পেছনে যৌক্তিক কারণ রয়েছে। একদিকে মেধাসম্পন্ন চাকরি প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে রাষ্ট্র সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণে আন্দোলনকারীদের দাবির পক্ষে ব্যাপক সমর্থন রয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের। দেশের সচেতন নাগরিক বিশেষজ্ঞ মহল কোটা সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছে।

সরকারি চাকরি বিসিএস, প্রাইমারি স্কুলে চাকরির ক্ষেত্রে সবখানে কোটা পদ্ধতি জালের মতো বিস্তার করেছিল। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটার কারণে প্রকৃত মেধাবীরা ঝরে পড়ছে। মেধাবীরা পরীক্ষায় ভালো করেও কোটার কারণে তাদের চাকরি হচ্ছে না। বঞ্চিত হচ্ছে লাখ লাখ বেকার যুবক। কোটা পদ্ধতির অপব্যবহারের ফলে প্রতিবছর বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে।

মুক্তিযোদ্ধা, তাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, পোষ্য, খেলোয়াড়, প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ নানা ধরনের কোটা বাংলাদেশে রয়েছে। অথচ মেধা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মেধাবীদের ঝরে পড়তে হয়।

তাছাড়া বিসিএস-এও কোটাধারীদের নিয়োগ দেওয়ার তো অভিযোগ রয়েছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে-মেয়ে, নাতিপুতির সরকারি চাকরিতে কোটা কতটা যৌক্তিক তা ভাবা দরকার। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি সংস্কার করে প্রকৃত মেধাবীদের মূল্যায়নের দাবিতে বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার আন্দোলনও হয়েছে।

যে যা-ই বলুক না কেন বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা মেধাবীদের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাই কোটা পদ্ধতি বাতিল না করে তা সংস্কার করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি সরকারি চাকরিতে যে, বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা রয়েছে তা সংস্কার করা প্রয়োজন। যাতে করে প্রত্যেকেই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি পেতে পারে।

মোহাম্মদ নজাবত আলী: সাবেক শিক্ষক ও কলামিস্ট, tnalichs@gmail.com

[সূত্র: দৈনিক করতোয়া, ১৫ই জুলাই ২০২৪]

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেট আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩-এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১৫ সদস্যবিশিষ্ট চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানকে বোর্ডের সদস্য সচিব করা হয়েছে। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে রয়েছেন: আইন ও বিচার বিভাগের সচিব; প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র); জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার প্রতিনিধি; বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক; বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি; ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষক ড. জাকির হোসেন রাজু; চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক রফিকুল আনোয়ার রাসেল; চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক, লেখক ও সংগঠক জাহিদ হোসেন; চলচ্চিত্র সম্পাদক ইকবাল এহসানুল কবির; চলচ্চিত্র পরিচালক খিজির হায়াত খান; চলচ্চিত্র অভিনেত্রী নওশাবা আহমেদ এবং চলচ্চিত্র পরিচালক তাসমিয়া আফরিন মৌ।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

বৃষ্টির মধ্যে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে হাজারও শিক্ষার্থী

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বিক্ষোভ করছেন তারা।

৩রা আগস্ট শনিবার বেলা সাড়ে ১০টায় রুয়েট প্রধান ফটকের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে এ সমাবেশ শুরু করেন তারা। পরে রুয়েটের প্রধান ফটকের সামনে থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে রাবির প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন। শিক্ষার্থীদের আজকের কর্মসূচিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) প্রায় ৫০ জন শিক্ষক অংশ নিয়েছেন। বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা– 'এক দুই তিন চার, স্বৈরাচার তুই গদি ছাড়', 'শিবির ট্যাগের ছলচাতুরী, বুইজা গেছে জনগণ', 'দফা এক দাবি এক, স্বৈরাচারের পদত্যাগ', 'নয় ছয় বুজিনা, কবে যাবি হাসিনা', 'আবু সাঈদ মরলো কেন, প্রশাসন জবাব চাই' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের।

রুয়েট শিক্ষার্থী তানভির হাসান বলেন, সারাদেশের সাথে সমন্বয় করে আজকে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছি। এখানে আমাদের একটাই দাবি স্বৈরাচার সরকার পদত্যাগ। সরকারের পদত্যাগ ছাড়া শিক্ষার্থী সমাজ আর ঘরে ফিরবে না। এ আন্দোলন আর কোটা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। পুলিশ প্রশাসন আমাদের ভাইদের উপর গুলিয়ে চালিয়েছে, তাদেরকে বলব এখন সাবধান হোন। আপনাদেরও ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের দিকে তাকান।

রাবি শিক্ষার্থী হাসান মাহমুদ বলেন, আবু সাঈদের মতো জীবন দিতে আজকে মাঠে নেমেছি। হয়ত জীবন দিবো নয়ত স্বৈরাচার সরকারকে পদত্যাগ করিয়ে মাঠ ছাড়ব। আমার ভাইগুলোর রক্তের দাগ বাংলার জমিনে এখনো শুকায়নি। কী দোষ ছিল তাদের। তারা সংবিধান অনুযায়ী তাদের অধিকারের কথা বলেছিল। আজকে আমাদের আন্দোলনের দাবি একটা, স্বৈরাচার সরকারকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। এ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. ফজলুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে আমরা তাদের সাথে যোগ দিয়েছি। আর কত ঘরে বসে আমার ছেলেদের রক্ত দেখব। শিক্ষার্থীদের গায়ে গুলি করতে স্বৈরাচার সরকারের কি একটুও বুক কাঁপেনি? আজ থেকে এ আন্দোলনে গুলি চালালে সেই গুলি আগে শিক্ষকদের গায়ে লাগবে, তারপর আমাদের ছাত্রদের।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের আর কোনো ভয় পাবার কারণ নেই, তাদের পিতৃতুল্য শিক্ষকরা আজ থেকে তাদের সামনে থাকবেন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে আমরা একাত্মতা পোষণ করছি এবং তাদেরকে সুরক্ষা দিতে সবসময় তাদের সাথেই আমরা আছি। গণহত্যার দায় স্বীকার করে স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন এ অধ্যাপক।

[সূত্র: সমকাল, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

জুলাই বিপ্লবে নারী

রহিমা আক্তার মৌ

২০০৯ সাল, কিছু একটা করব ভেবেই পত্রিকা পড়া বাড়িয়ে দিই। পড়তে পড়তে লিখতে ইচ্ছা করে। লেখাপড়া করতে হলে যেমন স্বরবর্ণ শিখে ব্যাঞ্জনবর্ণ শিখতে হয় আমিও তাই করি। পত্রিকার চিঠিপত্রের কলামে লিখতে লিখতে একটা সময় পত্রিকার

সম্পাদকীয় কলাম লেখা। জাতীয় সব পত্রিকায় লিখেছি। লিখতে হলে পড়ার বিকল্প নেই। পড়তে গিয়ে দেখি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। তখুনি তাদের নিয়ে ভাবনা আসে কিছু কাজ করার। ২০১০ সাল থেকে বিভিন্ন আন্দোলনের নারীদের নিয়ে কাজ করছি। *ভাষাকন্যারা*, *একাত্তর ও নারী* নামে দুইটা বই প্রকাশিত হয়। অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ সালে আসবে আমার ২৩তম বই *একাত্তর ও নারী*, ২৪তম বই *চব্বিশের কন্যারা*, ২৫তম বই *কলমকন্যারা* শিরোনামের বইগুলো। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে সরাসরি অংশ নেয় অনেক নারী (শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সব পেশাজীবী)।

৫ই জুন হাইকোর্ট ২০১৮ সালে সরকারের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট রায় দেয়। ৬ই জুন আদালতের রায়ের প্রতিবাদে ও কোটা বাতিলের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা বিক্ষোভ করে। ৯ই জুন হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করে। ১০ই জুন আন্দোলনকারীরা দাবি মেনে সরকারকে ৩০শে জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় ও ঈদুল আজহার কারণে আন্দোলনে বিরতি ঘোষণা করে। ৩০শে জুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে মানববন্ধন করে। ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে ও তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের সামনে অবস্থান নেয়। ২রা থেকে ৬ই জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ৭ই জুলাই শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড'-এর ডাক দেয় যার আওতায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, মহাসড়ক

অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ৮ ও ৯ই জুলাই একই রকম কর্মসূচি পালন করা হয়।' (তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া)

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে চাকরির ওপর। মেধার মূল্যায়ন করার জন্যেই তাদের আন্দোলন। কর্মক্ষেত্রে এখন সমান তালে চলছে নারীদের কর্মব্যস্ততা, তাই আন্দোলনে নারীপুরুষ কোনো ভেদাভেদ ছিল না। অবশ্য অনেক কর্মক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উপস্থিতি ও বেশি দেখা

যায়। পারিপার্শ্বিকতা ও প্রচারের ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে থাকলেও বাস্তবে নানাভাবে তারা ঠিক জড়িয়ে থাকে আন্দোলন সংগ্রামে। যা আমরা সেই ১৯৫২ থেকেই দেখে এসেছি।

১০ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে জড়ো হয়ে শাহবাগে গিয়ে স্থানটি অবরোধ করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান করে। দুপুরে জানা যায় কোটাব্যবস্থা বাতিল করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে চার সপ্তাহ স্থিতাবস্থা দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি শিক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অবরোধের কারণে ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থা স্থিমিত হয়ে আসে। দূরপাল্লার বাসগুলো আন্দোলনের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ১১ই জুলাই ৩টা থেকে শাহবাগ অবরোধের কথা থাকলেও বৃষ্টির ফলে শিক্ষার্থীরা শাহবাগে যাওয়ার পথে পুলিশের বাধাকে অতিক্রম করে ৪:৩০ টায় শুরু করে। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধার ফলে পিছিয়ে যায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে শাহবাগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়। চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে ২ নম্বর গেইট ও টাইগারপাস এলাকায় অবস্থান নেয়। তখন অনেক শিক্ষার্থী পুলিশের হামলার শিকার হয়। ঐ দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ হামলা করে। রাত ৯টায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শেষ করে তাদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১২ই জুলাইয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেয়।

১২ই জুলাই ৫টায় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে শাহবাগে জড়ো হয়ে অবরোধ করে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতে থাকলে ছাত্রলীগের একদল কর্মী আক্রমণ করে। বিকাল ৫টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন বাজারসংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধে সারাদেশের সঙ্গে রাজশাহীর রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৩ই জুলাই রাজশাহীতে রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। ঢাকায় ঢাবির শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করেন, তারা অভিযোগ করেন 'মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধার চেষ্টা করা হচ্ছে।' (তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া)

এই ১০ই জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই মাত্র ছয়দিন সময়। এই সময়টাতেই বিক্ষোভে কেঁপে ওঠে পুরো বাংলাদেশ। এক একটি জায়গায় দলীয় আর পুলিশবাহিনীর আক্রমণে ফুলেফেঁপে ওঠে ছাত্রসমাজ। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা আলাদা সংগঠন তৈরি হয়। তারা হল ছেড়ে ক্লাস ছেড়ে চলে আসে রাজপথে। সহপাঠী ও ভাইবোনের ওপর আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়ে তারা আরও সাহসী হয়ে নামে রাজপথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রিত হয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। আমজনতা এসে দাঁড়ায় তাদের পাশে। তারা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এক হয়ে যায়।

১৫ই এবং ১৬ই জুলাই কোটা সংস্কারের এক দফা দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছিল ছাত্রলীগ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপর ওই হামলা চালানো হয়। ওই দিন দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনে ছাত্রলীগের ওই হামলায় অন্তত ৫০ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী আহত হন। আহতের সংখ্যা আরও বেশিও হতে পারে বলে দাবি করেছিলেন আন্দোলনকারী কয়েকজন শিক্ষার্থী। হামলার ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে নিন্দার ঝড় ওঠে। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি দেশের মানুষ। একই দিনে ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপরও শাখা ছাত্রলীগের হামলার অভিযোগ ওঠে। ওই হামলায় গুরুতর আহত হন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজেই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের হামলায় আহত হন শতাধিক শিক্ষার্থী। এসব হামলার ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করাসহ তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার ঘোষণা দিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই সমন্বয়ক।' (তথ্যসূত্র: ২৭শে সেপ্টেম্বর, *দৈনিক বাংলা*)।

১৫ই জুলাই সকাল ১০টায় ব্যক্তিগত কাজে মেট্রোরেলে যাই ঢাকা মেডিকেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন নেমে রিকশায় মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে কাজ সেরে, বুয়েটের কোয়ার্টারে যাই বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজেরা নজরুল খালাম্মার সাথে দেখা করতে। ঘণ্টাখানেক ওনার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হয়। এই আলাপের কারণ একাত্তর ও নারী বই নিয়ে নতুন করে কাজ করা। কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে রিকশায় মেট্রোরেলের স্টেশনে আসতেই মাঝপথে নেমে যেতে হয় আন্দোলনের জন্য। পুরো টিএসসি জুড়ে শিক্ষার্থীদের মিছিল আর মিছিল। এপাশ-ওপাশ থেকে তাড়া দেওয়া, দৌড়ানো আর স্লোগান। কোনোভাবে রাজু ভাস্কর্যের সামনে দিয়ে 'ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভেতর দিয়ে স্টেশনে পৌঁছাই। বাসায় ফিরে ইউটিউব ও বিভিন্ন পেইজে দেখি নির্মমতার চিহ্ন। কী নির্মমভাবে ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। অনেক অডিও শুনি যেখানে নারীরা তাদের নিরাপত্তার অভাবে আর্তচিৎকার করেছিল। এসব নির্যাতনগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে যায় বলেই ১৯শে জুলাই ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় তৎকালীন সরকার।

শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, শিক্ষার্থীদের মায়েরাও নেমে এসেছে রাস্তায়। একটা ভিডিওতে দেখি নবনির্মিত ভবনে লেবারের কাজ করছে অনেক নারীরা। তখুনি টিয়ারগ্যাসের যন্ত্রণায় রাজপথের মানুষগুলো চিৎকার দিচ্ছে। কাজ করা সেসব নারীরা পাইপের পানি ভবনের কাজে না দিয়ে আহতদের দিকে দিচ্ছে। কেউ মুখ ধোয়ার পানি দিচ্ছে কেউ খাবারের পানি দিচ্ছে। এভাবেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এসেছে রাজপথে। আন্দোলনে না গিয়ে ঘরে বসেও অনেকে

আহত, নিহত হয়েছে বাহির থেকে আসা গুলি -টিয়ারগ্যাসের কারণে।

'বরিশালের বাসিন্দা সাবরিনা শশী একটি কাজে এসে আটকে যান ঢাকায়। অপেক্ষা করছিলেন আন্দোলন কমলে যাবেন কিন্তু তার মাঝে দূরপাল্লার বাস বন্ধ হয়ে যায়। বরিশাল যাবার সম্ভাবনা কমতে শুরু করে। শশী আন্দোলনে অংশ নেন ১৮ই জুলাই। ঢাকায় পরিচিত কেউ না থাকায়, একেকদিন একেক স্থানের আন্দোলনে যোগ দিতেন। ধানমন্ডি-২৭ থেকে সাইন্সল্যাব হয়ে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার কিংবা প্রেসক্লাবের মতো জায়গাতেও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনে অংশ নেওয়ার প্রথম দিনই ১৮ই জুলাই আহত হন তিনি।

ধানমন্ডি-২৭-এ মুখোমুখি সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান শশী। ইট-পাটকেল ও রাবার বুলেটে শশীকে আহত করে। শশী বলেন, 'আমাদের দিকে প্রবল বেগে প্যালেট, রাবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস ছোড়া হচ্ছিল, মাঝেমধ্যে গুলি বর্ষণও হচ্ছিল। অনেকেই আমার চোখের সামনে আহত হয়েছে। নিজেও হয়েছি কিন্তু চোখের সামনে এত এত ছোটোবড়ো ভাইবোনদের এরূপ হতাহত অবস্থা দেখে নিজের ক্ষতগুলোকে তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। কিছু রাবার বুলেট শরীরে ছিল কিন্তু জেদ ধরেছিলাম এই স্বৈরশাসকের পতন নিশ্চিত না করে শরীর থেকে বের করব না। কিন্তু যেহেতু শ্বাসকষ্টের রোগী, তার ওপর আন্দোলনে চশমা হারিয়ে চোখের দশাও করুন এমতাবস্থায় রাবার বুলেট, প্যালেটের থেকেও টিয়ারগ্যাস কষ্ট দিয়েছিল।' (তথ্যসূত্র: ১৪ই অক্টোবর ২০২৪, *ডেইলি স্টার বাংলা*)।

আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করা সাবরিনা শশী, শশীর সঙ্গে কথা হয় জুলাই বিপ্লব নিয়ে। ৫ই আগস্ট সরকার পতনের পর ৭ই আগস্ট সাবরিনা শশী বরিশালে ফিরে যান। আন্দোলন ও বিগত সরকার সম্পর্কে শশী বলেন, 'আমার জন্ম ২০০১ সালে। বোধ বুদ্ধি হবার পর থেকে একই সরকার দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত। তার ওপর সরকার এবং তাদের নেতাকর্মীদের কাজকর্ম ছিল বিরক্তির। মানুষকে এক প্রকার জিম্মি করে রেখেছিল তারা। কেউ কোনোভাবে সত্যি বললেই তার গলা চেপে ধরা হতো। শিল্প সংস্কৃতির মুখ চেপে ধরেছে তারা। কোনো কার্টুনিস্ট চাইলেই ইচ্ছে মতো আর্ট করতে পারবে না, তাদের মতের সঙ্গে মিল নেই এমন কোনো গায়ক গান গাইতে পারবে না। কোনো সাংবাদিক সত্য প্রচার করতে পারবে না যা তাদের বিরুদ্ধে যায়। লেখক চাইলেই ইচ্ছেমতো লিখতে পারবে না। আরও কতভাবে যে তারা সব শ্রেণির

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদ্‌যাপন ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত 'জুলাইয়ের কন্যারা আমরা তোমাদের হারিয়ে যেতে দেব না' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আহত কন্যাদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন- পিআইডি

সাধারণ জনগণের স্বাধীনতার অধিকার হরণ করেছে তার ঠিক নেই। সত্যি বলতে একটা স্বাধীন সার্বভৌম মুক্ত বাংলাদেশ এর প্রত্যাশায় আন্দোলনে অংশ নিই।'

শশী আরও বলেন, আমার বাবা একসময় বিডিআরে ছিলেন। সেই সুবাদেও অনেক কিছু জেনেছি। রিসার্চ করে বের করেছি বিডিআর বিদ্রোহের আসল ঘটনা কী ছিল। এরপর আইন না মেনে সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া, শুধু সত্যি বলার কারণে মানুষকে জেলে নিয়ে গিয়ে হেনস্তা করা হতো। পরোক্ষভাবে আমার একটা বইয়ে এটা নিয়ে লিখেছিলাম, রাজনৈতিক পার্টগুলো থাকায় আমার বইটি প্রকাশের মুখ দেখেনি। সরকার পতনের পর যেসব অরাজকতা চলেছে, ভাঙচুর করেছে, মানুষের উপর হামলা করেছে, এসবের পক্ষপাতও করি না আমি।'

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় 'জুলাইয়ের কন্যারা আমরা তোমাদের হারিয়ে যেতে দেব না' শীর্ষক নারী সমাবেশের অনুষ্ঠান। এতে জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে কর্মজীবী নারীদেরকেও অংশ নিতে দেখা যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া মেয়েদের ইতিহাস পরিবর্তনের নায়িকা বলে সম্বোধন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'আজ অনেক উচ্ছ্বাসের দিন, ক্ষোভের দিন, ইমোশনের দিন। আজ সব একসঙ্গে প্রকাশ করার দিন। উচ্ছ্বাস আছে বলেই তো আমরা এখানে আছি। উচ্ছ্বাস-ক্ষোভ না থাকলে আমরাতো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারতাম না। এগুলো আছে থাকবে। যখনই দরকার তখন প্রকাশ করব। যখন যেখানে যতটুকু দরকার ততটুকু প্রকাশ করব। সেই শক্তি যেন আমাদের থাকে। আজ তোমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, এটা আমার জন্য ঐতিহাসিক দিন। তোমরা বাংলাদেশকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছ, সেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঐতিহাসিক ঘটনার নায়িকারা বাংলাদেশে যা ঘটিয়েছে, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে অনেক অভ্যুত্থান হয়েছে; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কেউ তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেনি। তোমরা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছ। এটা তোমাদের সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে গড়া এক বিপ্লব। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূস বলেন, বাংলাদেশের মেয়েরা, স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, চাকরিজীবী, পরিবারের যে যেখান থেকে পেরেছে সবাই বিপ্লবে যোগ দিয়েছে এবং সমানভাবে এগিয়ে এসেছে ও

একেবারে পরিবর্তন করে দিয়েছে। ৫ই আগস্টের পর নতুন বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে।'

সাবরিনা শশী লেখালেখি করেন নিজের ভালোলাগা থেকে। প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাস *চৈত্র শেষে*। আসলে লিখলেই যে বই করতে হবে এমন মানসিকতা নিয়ে শশী লিখেন না। নাটকের স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। *চৈত্র শেষে* সামাজিক উপন্যাস। ২০২৪ সালে বহুমাত্রিক প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩৬০/ টাকা।

সাবরিনা শশীর বই সম্পর্কে ভূমিকায় লেখা, 'ঘটমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চিত্র এবং এক কাপুরুষের জন্য প্রিয় শিক্ষিকার আত্মহনন সদ্য যৌবনে পদার্পণ করা তিন বান্ধবীকেই করে তুলেছিল পুরুষ বিদ্বেষী। প্রতিজ্ঞা করেছিল কোনোদিন কোনো পুরুষের নিকটবর্তী হবে না। যে কারণে তার প্রিয় শিক্ষিকার জীবন নরকে পরিণত হলো, যাদের দম্ভে নিজের মা-চাচিরা স্তম্ভিতে নিশ্বাস নিতে পারছেন না তাদের নিকট নিজেদের কখনোই সমর্পণ করবে না। যে যার কর্মজীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। স্বস্তিতে বাঁচবে।

একজন রাজনীতিতে পাকাপাকি একটা অবস্থান করে নেবে, আরেকজন ভেবেছিল ওকালতি প্র্যাক্টিস করবে, অন্যজনের তেমন কোনো চিন্তাভাবনা না থাকলেও ধর্মের প্রতি প্রবল অনীহা তাকে এই সমাজ, শহর অতঃপর দেশ ছাড়তে একপ্রকার বাধ্যই করলো।

পুরুষ বিদ্বেষটাকে তখনও নিজেদের ভেতরেই জিইয়ে রেখেছিল তিনজনই কিন্তু একসময় এসে দেখলো সব পুরুষ এক হয় না। যে পুরুষ জীবন থেকে সমস্ত সুখ-সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে জীবনে খরতাপময় চৈত্র মাস নামিয়ে দিতে পারে সে পুরুষই আবার পরম যত্নে, ভালোবেসে চৈত্রের তাপদাহ থেকে মুক্তি দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে স্নিগ্ধ আবেশে। উপহার দিতে পারে শরতের মতো শুভ্র সতেজ দিন।'

রহিমা আক্তার মৌ: সাহিত্যিক ও কলামিস্ট,
rbabygolpo710@gmail.com

নদী রক্ষায় কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বাংলাদেশের নদীগুলোকে রক্ষা এবং দখল হওয়া নদী পুনরুদ্ধার করতে হবে। এলক্ষ্যে আইনের কঠোর প্রয়োগ শুরু করা হবে। এ কার্যক্রমে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ 'বিশ্ব নদী দিবস ২০২৪' এবং 'রিভার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' প্রদান উপলক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে নদী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'মার্ক এঞ্জেলো রিভার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' প্রদান করা হয়। এ বছর ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে মার্ক অ্যাঞ্জেলো রিভার অ্যাওয়ার্ড পান প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু, গবেষণা ক্যাটাগরিতে গবেষণা সংস্থা রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ ও সাংবাদিকতা ক্যাটাগরিতে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি ইফতেখার মাহমুদ।

বাংলাদেশ রিভার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মনির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুইডেন এম্বেসির পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফার্স্ট সেক্রেটারি নায়োকা মার্টিনেজ ব্যাকস্ট্রম, আয়োজক প্রতিষ্ঠান নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুর রব মোল্লা, হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির সমন্বয়কারী প্রফেসর ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দলের সভাপতি প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, পরিবেশ ও নদী রক্ষা উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এইচ এম সুমন, কর্ণফুলী সুরক্ষা পরিষদের সেক্রেটারি শেখ দিদারুল ইসলাম চৌধুরী ও বিআইডব্লিউটিএ-এর পরিচালক একেএম আরিফ উদ্দিন।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে রোববার সকালে শিবগঞ্জ সরকারি মডেল হাই স্কুলের সামনে একদফা দাবিতে কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

মডেল স্কুলের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শেষে আন্দোলনকারীরা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিবগঞ্জ উপজেলার সমন্বয়করা উপস্থিত ছিলেন। স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ। বিএনপির নেতারাও আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

এদিকে শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা রাজপথে থাকার ঘোষণা দিলেও তাদেরকে মাঠে দেখা যায়নি। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ এমপি বিকেলে জেলা আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসের সামনে তাদের অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

[সূত্র: সমকাল, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪]

সিরাজগঞ্জ-ঢাকা-উত্তরাঞ্চল রুটে দূরপাল্লার বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ

সরকার পতনের একদফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিন সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকা-উত্তরাঞ্চল রুটে দূরপাল্লার বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ।

৪ঠা আগস্ট রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলা শহরের এম এ মতিন বাস টার্মিনাল থেকে কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। টার্মিনালে পরিবহণ শ্রমিকদের কর্মহীন অলস বসে থাকতে দেখা যায়। সকালের প্রথমভাগে জেলা শহরের নিউ ঢাকা রোডের বাজার স্টেশন এলাকা থেকে কাউন্টার বাস সার্ভিস অভি ও সিরাজগঞ্জ লাইনের দু-তিনটি বাস ঢাকা অভিমুখে চান্দুরা ছেড়ে যায়।

শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে কড্ডার মোড় থেকে ২৫০ টাকা ভাড়ায় যাত্রী তুলতে দেখা যায় বাস চালক ও হেলপারদের।

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম গোল চত্বরে সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত অবস্থান করে দেখা যায় অল্প সংখ্যক আটকে পড়া বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক ঢাকা থেকে উত্তরাঞ্চল অভিমুখে যেতে দেখা যায়।

[সূত্র: সমকাল, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪]

গেজেট থেকে রাজশাহী বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩**—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে রাজশাহী বিভাগের শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
১১	৩৭	মোঃ মিনারুল ইসলাম	মৃত এনামুল হক	গোলজার বাগ, গোলজারবাগ, ওয়ার্ড নং-০১, রাজপাড়া, রাজশাহী	গোলজার বাগ, গোলজারবাগ, ওয়ার্ড নং-০১, রাজপাড়া, রাজশাহী
১৯	১২৫	মোঃ জাহাঙ্গীর	মোঃ বাছের সেখ	পারচিথুলিয়া, ভাঁড়ারা, পাবনা সদর, পাবনা	পারচিথুলিয়া, ভাঁড়ারা, পাবনা সদর, পাবনা
৩৯	৮৪৮	মোঃ মুনিরুল ইসলাম	মোঃ শামছুল হক	বীরকেদার, কাহালু, বগুড়া	বীরকেদার, কাহালু, বগুড়া
৪০	৯৩৯	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	মোঃ দুলাল উদ্দিন	বাসা/হোল্ডিং-৭৫৮, গ্রাম/রাস্তা: চর বলরামপুর, ডাকঘর: দোগাছী-৬৬০০, পাবনা সদর, পাবনা	বাসা/হোল্ডিং-৭৫৮, গ্রাম/রাস্তা: চর বলরামপুর, ডাকঘর: দোগাছী-৬৬০০, পাবনা সদর, পাবনা
৪৭	৩০১৭	মোঃ জুনাইদ ইসলাম রাতুল	মোঃ জিয়াউর রাহমান	সুলতানগঞ্জ পাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া	সুলতানগঞ্জ পাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া

৬০	৩৫৬৩	মোঃ মাহাবুব হাসান নিলয়	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	গ্রাম-ব্রজনাথপুর, ডাকঘর-দোগাছী, ওয়ার্ড-৫, দোগাছী, পাবনা সদর, পাবনা	গ্রাম-ব্রজনাথপুর, ডাকঘর-দোগাছী, ওয়ার্ড-৫, দোগাছী, পাবনা সদর, পাবনা
৯০	৫৮৯২	মোঃ রমজান আলী	মোঃ নজরুল ইসলাম	হাজীপুর, হাতিয়ানদহ, সিংড়া, নাটোর	হাজীপুর, হাতিয়ানদহ, সিংড়া, নাটোর
৯৫	৭৭৭৭	মোঃ আব্দুল মান্নান	আমির উদ্দিন সরকার	বনদিঘী পূর্বপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া	বনদিঘী পূর্বপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া
৯৬	৭৮৪৭	সিয়াম শুভ	আশিক	সেউজগাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া	সেউজগাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া
১০৮	১০১৫৯	মোঃ সাকিব আনজুম	মোঃ মাইনুল হক	রাণীনগর (শহিদ মিনারের বিপরীতে), ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী	রাণীনগর (শহিদ মিনারের বিপরীতে), ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
১২৬	১২১০৮	মোঃ জুলকার নাইন	মোঃ আঃ হাই আলহাদী	গ্রাম-স্বরপ, পোস্ট অফিস-নন্দনপুর, ইউনিয়ন-নন্দনপুর, সাঁথিয়া, পাবনা	গ্রাম-স্বরপ, পোস্ট অফিস-নন্দনপুর, ইউনিয়ন-নন্দনপুর, সাঁথিয়া, পাবনা
১২৮	১২৩৫৮	মোঃ অন্তর ইসলাম	মোঃ আব্দুল হক	কইজুড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	কইজুড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
১৪৩	১৩৫৮৬	মোঃ সোহেল রানা	মোঃ মতলেব আলী প্রামানিক	রামানন্দখাজুরা, সিংড়া, নাটোর	সোয়াইর, স্থাপনদিঘী-৬৪৫০, সিংড়া, নাটোর
১৫৮	১৩৮৪৩	মো হৃদয় আহমেদ	মোঃ রাজু আহমেদ	ছাতারদিঘী, কুসুম্বী, সিংড়া, নাটোর	ছাতারদিঘী, কুসুম্বী, সিংড়া, নাটোর।
২০৫	১৫৮২৩	তারেক হোসেন	মোঃ আশহাদুল ইসলাম	গ্রাম-দক্ষিণ ইসলামপুর, ডাকঘর-চৌডালা, উপজেলা/থানা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গ্রাম-দক্ষিণ ইসলামপুর, ডাকঘর-চৌডালা, উপজেলা/থানা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২০৯	১৭১২৮	রিদোয়ান শরীফ রিয়াদ	আহম্মদ উল্লাহ বাদল	বাড়ি-২৭, রোড-০৫, রাজাবাড়ী, তুরাগ. গাজীপুর	শ্রীরামপুর, থানা-বদলগাছী, জেলা-নওগাঁ
২১৯	১৭৫১৫	মোঃ সিয়াম হোসেন	মোঃ কদ্দুছ আলী	গোপারেখী দক্ষিণ, গুমুর্খী বেতিল, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	গোপারেখী দক্ষিণ, গুমুর্খী বেতিল, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
২২০	১৭৫৩১	শিহাব আহমেদ	শফি মিয়া	মাদবপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	মাদবপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
২২১	১৭৫৪১	মোঃ ইয়াহিয়া আলী	মোঃ শাহজাহান আলী	খুকনী ঝাউপাড়া, খুকনী, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	খুকনী ঝাউপাড়া, খুকনী, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
২৩৭	১৯৭০২	মোঃ কমর উদ্দিন খাঁ	কিছর উদ্দিন খাঁ	আকাশতারা, ওয়ার্ড নং-২০, বগুড়া সদর, বগুড়া	আকাশতারা, ওয়ার্ড নং-২০, বগুড়া সদর, বগুড়া
২৪৭	২০৩৭৫	মোঃ আবু রায়হান	মোঃ শাহাজাহান আলী	চকসুখানগাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৪, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া	চকসুখানগাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৪, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

২৫৩	২০৭৮১	মোঃ শাকিল হাসান	মোঃ মোকলেছার রহমান	বাহাদুরপুর, নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া	বাহাদুরপুর, নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া
২৫৫	২০৮০০	মোঃ সোহেল রানা	ফেরদৌস রহমান	ইসলামপুর, ভূস্কুর হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম, বগুড়া	ইসলামপুর, ভূস্কুর হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম, বগুড়া
২৭২	২১২৭৬	মোঃ রাসেল রানা	Md. Pintu Rahman	কশব ভোলাগাড়ী, পোস্টঃ কশব, থানাঃ মান্দা, জেলাঃ নওগাঁ	কশব ভোলাগাড়ী, পোস্টঃ কশব, থানাঃ মান্দা, জেলাঃ নওগাঁ
২৮৮	২১৯৭৭	শাওন খান সিয়াম	বকুল খান	তালতলা, হাফরাস্তা, নাটোর সদর, নাটোর	তালতলা, হাফরাস্তা, নাটোর সদর, নাটোর
২৮৯	২১৯৮০	মিকদাদ হোসেন খান	দেলোয়ার হোসেন খান	উপশহর, আলাইপুর, নাটোর সদর, নাটোর	উপশহর, আলাইপুর, নাটোর সদর, নাটোর
২৯০	২১৯৮৬	মোঃ শরিফুল ইসলাম (মোহন)	মোঃ আঃ মজিদ	উত্তর বড় গাছা, উত্তর বড় গাছা, ওয়ার্ড নং-০৭, নাটোর সদর, নাটোর	উত্তর বড় গাছা, উত্তর বড় গাছা, ওয়ার্ড নং-০৭, নাটোর সদর, নাটোর
২৯১	২১৯৯০	ইয়াসিন আলী	ফজর আলী	মল্লিকহাটি পশ্চিমপাড়া, নাটোর সদর, নাটোর	মল্লিকহাটি পশ্চিমপাড়া, নাটোর সদর, নাটোর
২৯২	২১৯৯৩	মোঃ মেহেদী হাসান	মোঃ বকুল হোসেন	উত্তরবড়গাছা, ওয়ার্ড নং-০৭, নাটোর সদর, নাটোর	উত্তরবড়গাছা, ওয়ার্ড নং-০৭, নাটোর সদর, নাটোর
৩২৯	২২২৮৪	মোঃ মিনহাজ হোসেন	মোঃ বক্কর সরদার	গ্রামঃ রামশালা, ডাকঘরঃ জাফরপুর (৫৯৪০), ইউনিয়ন-সোনামুখি, উপজেলাঃ আক্কেলপুর, জেলাঃ জয়পুরহাট	গ্রামঃ রামশালা, ডাকঘরঃ জাফরপুর (৫৯৪০), ইউনিয়ন-সোনামুখি, উপজেলাঃ আক্কেলপুর, জেলাঃ জয়পুরহাট
৩৩১	২২২৯১	রিতা আক্তার	মোঃ আশরাফ আলী	গ্রাম: তালখুর, ডাক: শান্তিনগর, উপজেলা: কালাই, জেলা: জয়পুরহাট	গ্রাম: তালখুর, ডাক: শান্তিনগর, উপজেলা: কালাই, জেলা: জয়পুরহাট
৩৪৬	২২৩২৩	মোঃ মতিউর রহমান	আয়ুব আলী	১১৭/১, দারুস সালাম রোড পূর্ব, পাইকপাড়া ষ্টাফ কোয়ার্টার, ওয়ার্ড নং-১২, মিরপুর, ঢাকা	গ্রাম-কমলাকান্তপুর, ডাকঘর-রানীহাটি, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩৯০	২২৪০৪	শেখ ফাহমিন জাফর	শেখ আবু জাফর	সাং -তারাটিয়া, পোস্টঃ রঘুরামপুর, থানাঃ আত্রাই, জেলাঃ নওগাঁ	সাং-তারাটিয়া, পোস্টঃ রঘুরামপুর, থানাঃ আত্রাই, জেলাঃ নওগাঁ
৩৯৭	২২৪৩২	মোঃ বিপ্লব মন্ডল	মোঃ লুৎফর মন্ডল	শিমুলিয়া, সান্তাহার, নওগাঁ সদর, নওগাঁ, রাজশাহী	শিমুলিয়া, সান্তাহার, নওগাঁ সদর, নওগাঁ, রাজশাহী

৪০১	২২৪৩৯	সোহানুর রহমান রঞ্জু খান	মো. মাজেদ আলী খান	মাছুমপুর দক্ষিণপাড়া, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	মাছুমপুর দক্ষিণপাড়া, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ
৪১০	২২৪৫৪	মো. সুমন শেখ	মো. গোনজের আলী	গয়লা, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	গয়লা, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ
৪২০	২২৪৬৬	মোঃ রনি	মোঃ দিলবর আলী	পঞ্চদাশ ললখুর, বুড়িগঞ্জ, শিবগঞ্জ, বগুড়া	পঞ্চদাশ ললখুর, বুড়িগঞ্জ, শিবগঞ্জ, বগুড়া
৪২১	২২৪৬৮	মো. আব্দুল লতিফ	আসু মুন্সি	গয়লা, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	গয়লা, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ
৪২৯	২২৪৭৭	মো: নজরুল ইসলাম	মো: জামাল সেখ	গ্রাম: বারইভাগ, ডাকঘর: বারইভাগ-৬৭২০, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	গ্রাম: বারইভাগ, ডাকঘর: বারইভাগ-৬৭২০, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৪৩২	২২৪৮৩	মো: লেবু	যেতুল্লা	দুমরাই, ডাকঘর : রুদ্রপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	দুমরাই, ডাকঘর : রুদ্রপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৪৩৮	২২৪৮৯	মোঃ সুজন মাহমুদ	মোঃ আব্দুর রশিদ	গ্রামঃ রূপপুর, ডাকঘরঃ শাহজাদপুর-৬৭৭০, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	গ্রামঃ রূপপুর, ডাকঘরঃ শাহজাদপুর-৬৭৭০, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
৪৪৪	২২৪৯৯	আস-সাবুর	মোঃ এনাব নাজেজ জাকী	উকিলপাড়া দপ্তরীপাড়া, পোস্টঃ নওগাঁ, থানাঃ নওগাঁ সদর, জেলাঃ নওগাঁ	উকিলপাড়া দপ্তরীপাড়া, পোস্টঃ নওগাঁ, থানাঃ নওগাঁ সদর, জেলাঃ নওগাঁ
৪৪৮	২২৫০৩	সাব্বির হাসান	শাহিন আলম	তেলিহাটা মধ্যপাড়া, সোনারায়, গাবতলী, বগুড়া	তেলিহাটা মধ্যপাড়া, সোনারায়, গাবতলী, বগুড়া
৪৪৯	২২৫০৫	মোঃ জিল্লুর সরদার	মোঃ মুসা সরদার	গোড়দহ (উত্তর পাড়া), ওয়ার্ড নং-০৫, গাবতলী, বগুড়া।	গোড়দহ (উত্তর পাড়া), ওয়ার্ড নং-০৫, গাবতলী, বগুড়া।
৪৭১	২২৫৩০	মোঃ মাহফুজ	মোঃ মজনু প্রাং	কুটুরবাড়ি, জোড়গাছাহাট, বগুড়া সদর, বগুড়া	কুটুরবাড়ি, জোড়গাছাহাট, বগুড়া সদর, বগুড়া
৪৮৩	২২৫৪৯	বায়েজিদ বোস্তামী	সাখাওয়াত হোসেন	কৈগ্রাম ফারসিপাড়া ওয়ার্ড নং -০৪, পোস্টঃ ধামইরহাট, থানাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ	কৈগ্রাম ফারসিপাড়া ওয়ার্ড নং -০৪, পোস্টঃ ধামইরহাট, থানাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ
৪৯০	২২৫৫৭	আব্দুল আহাদ সৈকত	নজরুল ইসলাম	গ্রাম-উত্তর দিঘলকান্দি, ডাক: বালুয়াহাট, উপজেলা-সোনাতলা, বগুড়া	গ্রাম-উত্তর দিঘলকান্দি, ডাক: বালুয়াহাট, উপজেলা-সোনাতলা, বগুড়া

৫০৩	২২৫৭৮	মাহফুজ আলম শ্রাবন	মোঃ মোশাররফ হোসেন	দোগাছী, বোয়ালিয়া, নওগাঁ সদর, নওগাঁ, রাজশাহী	দোগাছী, বোয়ালিয়া, নওগাঁ সদর, নওগাঁ, রাজশাহী
৫১৭	২২৫৯৩	মোঃ আব্দুল হান্নান খান	মোঃ সহিদুর রহমান খান	৭, ১, ব্লক ডি সেকশন ১৫, ১৪-ডি, ওয়ার্ড নং-০৪, কাফরুল, ঢাকা।	ইদ্রাকপুর, সাঁথিয়া, পাবনা।
৫১৮	২২৫৯৪	মোঃ সেলিম হোসেন	মোঃ সেকেন্দার আলী	পালি কান্দা, পিরব, শিকাঞ্জ, বগুড়া	পালি কান্দা, পিরব, শিকাঞ্জ, বগুড়া
৫৪৬	২২৬৩০	মোঃ রায়হান আলী	মোঃ মামুন সরদার	সাং-পানিশাইল রামকুড়া, পোস্টঃ রামকুড়া নিয়ামতপুর, থানাঃ নিয়ামতপুর, জেলাঃ নওগাঁ	সাং-পানিশাইল রামকুড়া, পোস্টঃ রামকুড়া নিয়ামতপুর, থানাঃ নিয়ামতপুর, জেলাঃ নওগাঁ
৬৪৬	২২৭৭৩	মোঃ নজিবুল সরকার	মোঃ মজিদুল সরকার	গ্রাম: রতনপুর, ইউনিয়ন: ধরঞ্জী, উপজেলা: পাঁচবিবি, জেলা: জয়পুরহাট	গ্রাম: রতনপুর, ইউনিয়ন: ধরঞ্জী, উপজেলা: পাঁচবিবি, জেলা: জয়পুরহাট
৬৪৮	২২৭৭৫	মোঃ রায়হান আলী	মোঃ মুসলেম উদ্দিন	মঙ্গালপাড়া, শিলমাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী	মঙ্গালপাড়া, শিলমাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী
৬৪৯	২২৭৭৬	মেহেদী হাসান	আলতাফ শেখ	তেঘর বিশা, জংলুপাড়া, শেখ পাড়া, জয়পুরহাট	তেঘর বিশা, জংলুপাড়া, শেখ পাড়া, জয়পুরহাট
৭২২	২৪৫৬৯	রহমত মিয়া	মোঃ মুনজু মিয়া	জামথল কাজলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	জামথল কাজলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া
৭৭৮	২৫২৭৭	মোঃ শিহাব উদ্দিন	মোঃ সেলিম প্রামানিক	প্রামানিক পাড়া, জামতৈল, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	প্রামানিক পাড়া, জামতৈল, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ
৭৯৭	২৬১৭৯	ফিরোজ আহমেদ	মোঃ এনায়েত আলী	পিআইও অফিস, সদর উপজেলা, যশোর	১৯৫, বালিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং-২৭(পার্ট), বোয়ালিয়া, রাজশাহী,
৮১৫	৩১৮০১	মোঃ মনিরুজ্জামান	মোঃ কোরবান আলী	সাভার, শ্রীপুর, ঢাকা।	নগরদোলা, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
৮১৯	৩৩০৪৮	খোকন	আজিজুল সরদার	নেওলাই পাড়া, থানা: বেড়া, জেলা: পাবনা।	নেওলাই পাড়া, থানা: বেড়া, জেলা: পাবনা।
৮৩১	৩৫২০৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মোঃ বাহার উদ্দীন	৩৯/৫, কাজিরগাঁও, আলী টাওয়ার, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	মেছড়া হাটপাড়া. মেছড়া-৬৭০০, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার তৃতীয়াংশ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩**—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে ঢাকা বিভাগের (অংশ-০৩) শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

২৮১	২১৭৮৫	মুহাম্মদ জান শরীফ	শরীফ শাসসুল আলম	২৮/১৯, মোল্লা বাড়ী সড়ক, গোয়ালচামট, মোল্লা বাড়ী সড়ক, ওয়ার্ড নং-১২, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	২৮/১৯, মোল্লা বাড়ী সড়ক, গোয়ালচামট, মোল্লা বাড়ী সড়ক, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
৩২০	২২২৬৬	আনোয়ার মিয়া	আমির হোসেন	শেখের চর, শেখের চর, শীলমান্দি, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	শেখের চর, শেখের চর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
৩২২	২২২৬৮	মো: ইরফান ভূঁইয়া	মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ভূইয়া	৩নং ওয়ার্ড, নিমাইকাসারী, কানেলপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	মাদানীনগর, সানারপাড়, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।
৩২৪	২২২৭০	মো: শাওন	মৃত মজিবুর রহমান মিয়া	ইসলামাবাদ, মাদান্দে, নুরালাপুর, মাদান্দে, নরসিংদী	ইসলামাবাদ, মাদান্দে, নুরালাপুর, মাদান্দে, নরসিংদী
৩২৬	২২২৭২	ইমরান হাসান	মোঃ ছালে আহাম্মেদ	পিরোজপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।	পিরোজপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

৩২৮	২২২৮১	কাজী মোঃ আব্দুর রহমান	কাজী মোঃ আমির উদ্দিন মিয়া	গ্রাম-দক্ষিন চৌয়া, পো-আমদিয়া, ইউনিয়ন-মেহেরপাড়া থানা-মাধবদী উপজেলা-নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী	গ্রাম-দক্ষিন চৌয়া, পো-আমদিয়া, ইউনিয়ন-মেহেরপাড়া থানা-মাধবদী উপজেলা-নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী
৩৪০	২২৩১৫	মোঃ সিয়াম	মো: সিবলী রেজা	গ্রামঃ শাষপুর পো:শাষপুর ইউনিয়ন: আয়ূবপুর থানা+উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী	গ্রামঃ শাষপুর, পো:শাষপুর ইউনিয়ন: আয়ূবপুর থানা+উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী
৩৪৫	২২৩২২	তামিন হৃদয়	তমিজ উদ্দিন মীর	গ্রামঃ দক্ষিন সাধারচর, পো:সাধারচর, ইউনিয়ন: সাধারচর থানা+ উপজেলাঃ শিবপুর জেলাঃ নরসিংদী	গ্রামঃ দক্ষিন সাধারচর, পো:সাধারচর, ইউনিয়ন: সাধারচর থানা+ উপজেলাঃ শিবপুর জেলাঃ নরসিংদী
৩৫৪	২২৩৩৪	মোঃ সুজন মিয়া	কছুমুদ্দিন	গ্রামঃ মুনসেফেরচর, পো:সৈয়দনগর ইউনিয়ন: পুটিয়া থানা+উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী	গ্রামঃ মুনসেফেরচর, পো:সৈয়দনগর ইউনিয়ন: পুটিয়া থানা+উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী
৩৫৫	২২৩৪১	মাবরুর হোসেন রাব্বি	আব্দুল হাই	বটতলা, দক্ষিণ শিয়ারচর, কুতুবপুর ইউনিয়ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ	বটতলা, দক্ষিণ শিয়ারচর, কুতুবপুর ইউনিয়ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
৩৫৬	২২৩৪২	ইমন মিয়া	কাঞ্চন মিয়া	৩২/১১ রায়ের বাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা.	গ্রাম-মধ্য অষ্টগ্রাম, সোনাই দিঘী পশ্চিমপাড়া, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ
৩৫৯	২২৩৫১	আহ্সান কবির	হুমায়ুন কবির	২৬/৯, ভাগলপুর, দঃ দরিয়াপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, সাভার, ঢাকা।	সানারপাড়, নারায়ণগঞ্জ।
৩৬১	২২৩৫৫	হযরত বিল্লাল	মোঃ হোসেন	কলতাপাড়া, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ	কলতাপাড়া, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
৩৬৭	২২৩৬৩	মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা	মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা	০৫৩৩-০০, শাখারপাড়, লুন্দি, প্রধান সড়ক, ওয়ার্ড নং-০৬, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর, ঢাকা	০৫৩৩-০০, শাখারপাড়, লুন্দি, প্রধান সড়ক, ওয়ার্ড নং-০৬, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর, ঢাকা
৩৬৯	২২৩৬৫	মোঃ হাছান মিয়া	চুন্নু মিয়া	কাশেমের বাড়ি, বীরগাঁও পশ্চিম পাড়া, নিলক্ষা, নিলক্ষীয়া, রায়পুরা, নরসিংদী, ঢাকা	কাশেমের বাড়ি, বীরগাঁও পশ্চিম পাড়া, নিলক্ষা, রায়পুরা, নরসিংদী, ঢাকা
৩৭০	২২৩৬৬	ছোবাহান মুন্সী	আইয়ূব আলী মুন্সী	বাসুদেবপুর, কাশিমপুর, রাজৈর, মাদারীপুর	বাসুদেবপুর, কাশিমপুর, রাজৈর, মাদারীপুর

৩৭১	২২৩৬৭	সাওন মুফতী	সাহাবুদ্দিন মুফতী	পুর্ব দারাদিয়া, রাজৈর, মাদারীপুর, ঢাকা	পুর্ব দারাদিয়া, রাজৈর, মাদারীপুর, ঢাকা
৩৭২	২২৩৭০	ছলেমান	মিরাজ বেপারী	আলনুর টাওয়ার, মাদনী নগর, শিমরাইল, ওয়ার্ড নং-০৩, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	আলনুর টাওয়ার, মাদনী নগর, শিমরাইল, ওয়ার্ড নং-০৩, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।
৩৭৩	২২৩৭১	সফিকুল	আব্দুল আজিজ	বালুয়াকান্দী, বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	বালুয়াকান্দী, বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
৩৭৫	২২৩৭৪	জিন্নাহ মিয়া	জাকির হোসেন	চেয়ারম্যানের বাড়ি, নলবাটা, আমীরগঞ্জ, রায়পুরা, নরসিংদী	চেয়ারম্যানের বাড়ি, নলবাটা, আমীরগঞ্জ, রায়পুরা, নরসিংদী
৩৭৭	২২৩৭৬	মো: জনি	মো: ইয়াসিন	বালোয়া, দিঘীর পাড়, আমিনপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ	বালোয়া, দিঘীর পাড়, আমিনপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
৩৭৮	২২৩৭৭	মোঃ সিফাত হোসেন	মোঃ কামাল হাওলাদার	চর পালরদী, রমজানপুর, কালকিনী, মাদারীপুর।	চর পালরদী, রমজানপুর, কালকিনী, মাদারীপুর।
৩৮১	২২৩৮১	কুদ্দুস মিয়া	জামাল মিয়া	গ্রাম-চেংগাহাটি দিঘীরপাড় বস্তি, ডাকঘর-পাটুলী ২৩৩৬ থানা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ	গ্রাম-চেংগাহাটি দিঘীরপাড় বস্তি, ডাকঘর-পাটুলী ২৩৩৬ থানা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ
৩৮৪	২২৩৯৪	বাধন	রোমান হাওলাদার	সালধ, ডিংগামানিক, নড়িয়া, শরীয়তপুর	সালধ, ডিংগামানিক, নড়িয়া, শরীয়তপুর
৩৮৫	২২৩৯৫	মো: স্বজন	মো: জাকির হোসেন	কুশিয়ারা পূর্বপাড়া, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ	কুশিয়ারা পূর্বপাড়া, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
৩৮৮	২২৩৯৯	মোঃ তরিকুল ইসলাম রুবেল	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	গ্রামঃ হাছলা, ডাকঘরঃ দামিহা-২৩১৬, তারাইল, কিশোরগঞ্জ।	গ্রামঃ হাছলা, ডাকঘরঃ দামিহা-২৩১৬, তারাইল, কিশোরগঞ্জ।
৪১৪	২২৪৫৮	মোঃ মোহসীন	ছলিম উদ্দিন	বাহাদুরপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	বাহাদুরপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
৪২৪	২২৪৭১	সজল মিয়া	মোঃ হাছান আলী	মাহমুদপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	মাহমুদপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
৪২৮	২২৪৭৬	মোঃ নাইমুর রহমান	মোঃ খলিলুর রহমান	ক ৭৫/২, কালাচাদপুর, ওয়ার্ড নং-১৮, গুলশান, ঢাকা।	টেংরা মারি, ভান্ডারী কান্দি, শিবচর, মাদারীপুর।
৪৩৫	২২৪৮৬	মোঃ রুবেল	মোঃ আজহারুল ইসলাম	৩১, লালাসরাই, ওয়ার্ড নং-১৫(পার্ট), ভাষানটেক, ঢাকা।	চরতালযাংগা, ওয়ার্ড নং-১৫(পার্ট), কাফরুল, কিশোরগঞ্জ।

রাজশাহী কলেজে শহিদদের স্মরণে দোয়া, আট দাবি ঘোষণা

রাজশাহী কলেজে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী গণহত্যায় শহিদদের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আট দফা দাবি পেশ করেছে শিক্ষার্থীরা। ৬ই আগস্ট মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে কলেজের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো– সকল ধরনের রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত করতে হবে। ক্যাম্পাসের ভেতরে সরাসরি কোনো শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী সরাসরি কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতে পারবে না। শিক্ষকদের অবশ্যই ভুল স্বীকার করতে হবে এবং পরবর্তীতে যে-কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিতে হবে। রাজনৈতিক কোনো কারণে কলেজে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের কোনো ক্ষতি হলে প্রশাসনকে দায়ভার নিতে হবে। ছাত্রলীগকে পুরোপুরি বহিষ্কার করতে হবে এবং গত ১৬ই জুলাই সংগঠিত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসহ দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি অরাজনৈতিক স্টুডেন্ট কমিউনিটি গঠন করতে হবে যেখানে কলেজ প্রশাসন তাদের সম্মতি জানাবে এবং কলেজে কোনো ধরনের সমস্যা হলে শিক্ষার্থীরা কমিউনিটিকে অবগত করবে। কলেজের ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি মুক্ত করে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সম্প্রতি ছাত্রীনিবাসে নাশকতা চালানোর যে ন্যাক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসহ দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। কলেজ ক্যাম্পাস ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের নিরাপত্তা প্রণয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র কলেজ প্রশাসনের। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে প্রশাসন দায়ী থাকবেন।

পরে শিক্ষার্থীরা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করেন। এ সময় রাজশাহী কলেজের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুভ জান্নাত, আব্দুল বারী, মহুয়া জান্নাতসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

[সূত্র: রাজশাহী পোস্ট.কম, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

We want
Justice!

শুনো
মহাজন
আমরা
অনেক জন!
JUSTICE
WASA
JUSTICE
FREE

বগুড়ায় শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ
পোড়া দেয়াল হচ্ছে রঙিন, শৃঙ্খলা ফিরেছে সড়কে

কেউ আগুনে পোড়া ভবনের দেয়াল রংতুলিতে রাঙাচ্ছেন, কেউবা আবার সুশৃঙ্খল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় দিয়েছেন নজর। শহরের নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি আবর্জনা সাফ করছেন কেউ কেউ। বিধ্বস্ত বগুড়া শহরের শৃঙ্খলা ফেরাতে এভাবেই হাতে হাত রেখে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ফলশ্রুতিতে যানজটের এ শহরে গত দুদিন নেই কোনো গাড়ির জট। সড়ক বিভাজকে লাগানো হচ্ছে নানা জাতের গাছ।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে কিছু দুর্বৃত্ত শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, করে লুটপাট। পুড়িয়ে দেওয়া হয় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়, সদর থানা ও ফাঁড়ি, সদর উপজেলা পরিষদ, শিক্ষা অফিস, ভূমি অফিসসহ বহু সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা। হামলা-লুটতরাজ চালানো হয় বাণিজ্যিক বিপণিকেন্দ্র ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। সহিংস পরিস্থিতিতে শহরের সব থানা-ফাঁড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় পুলিশ। এরপর কর্মবিরতি শুরু

হওয়ায় তারা কেউ এখন কর্মস্থলে নেই। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুদিন হলো লাঠি-বাঁশি নিয়ে তারা শহরের রাস্তায় যানজট নিরসনে কাজ করছেন। কেউ কেউ শহরের রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্নতার কাজ করছেন।

৭ই আগস্ট বুধবারও শহরের সাতমাথা থেকে শুরু করে সার্কিট হাউস সড়ক, জলেশ্বরীতলা রোমেনা আফাজ সড়ক, শহীদ আব্দুল জব্বার সড়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকী সড়ক, পৌরসভা লেনসহ বিভিন্ন সড়কে পড়ে থাকা আবর্জনা, ইটের টুকরা, ভাঙা কাচ, পুড়ে যাওয়া জিনিসপত্র, ভস্মীভূত ছাই, খালি পানির বোতল, পলিথিন কুড়াতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। ধ্বংসস্তূপ থেকে এসব সড়কের চেহারা বদলে মুহূর্তেই হয়ে যায় ঝকঝকে। অনেকে ঝাড়ু নিয়ে আবর্জনা সরিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেন। তারা জানান, সড়ক অপরিষ্কার থাকায় চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। চলাচলের রাস্তা নির্বিঘ্ন করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শহরের ব্যস্ততম সড়কগুলোতে শৃঙ্খলা ফেরাতে ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী চালককে জরিমানাও করেন শিক্ষার্থীরা। হেলমেট না থাকা, লেন ভেঙে যান চলাচলের মতো ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করায় চালকদের ২০ থেকে ১০০ টাকা জরিমানা করতে দেখা গেছে। জরিমানার এ টাকা দিয়ে শহরের রাস্তায় বৃক্ষরোপণ, শহিদমিনার নির্মাণ, শহরের দেয়াল থেকে পোস্টার অপসারণ, দেয়াল লিখন মুছে দেওয়া, বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণ, গ্রাফিতি আঁকাসহ পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা।

কলেজছাত্রী আবিলা মেহরিন বলেন, আমরা আমাদেরই আঁকার চেষ্টা করছি। আমাদের ওপর যে অন্যায় হয়েছে, তা তুলিতে ফুটিয়ে তুলছি। আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাও থাকছে এসব চিত্রে। এদেশ সবার। তাই সবাই মিলে একটি বসবাসযোগ্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

[সূত্র: সমকাল, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

উন্নত গণপরিবহণ ও পথচারীবান্ধব শহর গড়ার প্রত্যয়

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-এর উদ্যোগে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় ঢাকার হাতিরঝিলে ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস পালিত হয়।

ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহণ ও নিরাপদ হাঁটাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ডিটিসিএ কর্তৃপক্ষ হাতিরঝিলে বাইসাইকেল র‍্যালি ও হাঁটা, হাতিরঝিল এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নগরীর একটা রাস্তা একঘণ্টা ব্যক্তিগত গাড়ি মুক্তরাখাসহ এক আলোচনাসভার আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিনিয়র সচিব বলেন, একটি সড়ককে যেন সপ্তাহে একদিন গাড়িমুক্ত রাখা যায়, সেজন্য সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণে আমরা সচেষ্ট থাকব।

সভাপতির বক্তৃতায় ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আখতার বলেন, জনবান্ধব নগর যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ডিটিসিএ ২০১৬ সাল থেকে বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সম্পৃক্ত। নগর যাতায়াত ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সকলের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিতের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় আমরা সচেষ্ট থাকব।

ড. আদিল মুহাম্মদ খান মূল প্রবন্ধে বলেন, বাস, রেল ও নৌপথ এবং হাঁটার উপযোগী পরিবেশ তৈরি সর্বোপরি বহুমাধ্যমভিত্তিক সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

হাতে হাত রেখে স্লোগানের সময় ঝাঁজরা ভাইয়ের বুক

ভাইবোন দুজনই স্নাতকের শিক্ষার্থী। মনিরুল ইসলাম মনির দুই বছরের বড়ো নাফিসা খাতুন থেকে। তাই যেমন খুনসুটি হয়, তেমনি অপূর্ব বন্ধন তাদের। বগুড়ার কাহালু উপজেলার কৃষক শামসুল হক ও গৃহিণী মোরশেদা বেগমের স্বপ্ন– ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হয়ে নিষ্ঠাবান মানুষ হবে। সে লক্ষ্যে অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু ৪ঠা আগস্ট পুলিশের বুলেট সব স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে!

ওই দিন সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যাওয়ার আগে মনির ফোন করে ডেকে নেন নাফিসাকেও। দুজন হাতে হাত ধরে স্লোগান দিচ্ছিলেন। বেলা ১১টার দিকে তাদের মিছিল দুপচাঁচিয়া থানার সামনে যেতেই গুলি চালায় পুলিশ। নাফিসার হাত থেকে মনির ছিটকে মাটিতে পড়েন। নাফিসা দেখতে পান, ভাইয়ের বুক গুলিতে ঝাঁজরা। মিছিলে থাকা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় মনিরকে কাঁধে তুলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র মনিরের বাড়ি কাহালু উপজেলার বীরকেদার গ্রামে। গত ২৪শে আগস্ট শনিবার সরেজমিন গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, মনিরের শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরিবার। মা-বাবা বাক্‌রুদ্ধ। ট্রমা থেকে বের হতে পারেননি একমাত্র বোন। ভাইয়ের মৃত্যু বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি।

বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্রী নাফিসা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার সব সময় মনে হয়, ভাই বেঁচে আছে। ওর কথা কানে বাজে এই আন্দোলন ন্যায় প্রতিষ্ঠার, বৈষম্য নিরসনের। তুই আয়, আমরা একসঙ্গে মিছিল করব। ভাই, আমাকে এভাবে একা রেখে যাবে, বুঝতে পারিনি। মিছিলে না গেলে হয়ত এমন মৃত্যু দেখতে হতো না! কান্নায় বুকটা ভেঙে যায়।

নাফিজা বলেন, মনির ছোটোবেলা থেকে নানা স্বেচ্ছাসেবী কাজে যুক্ত। পড়ালেখার পাশাপাশি টিউশনি এবং বাবার কৃষিকাজে সব ধরনের সহযোগিতা করত। অসচ্ছল ও অসহায় মানুষের সহায়তায় কাজ করা 'হিকমা ইয়ুথ সোসাইটি'র কোষাধ্যক্ষ ছিল। শুরু থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলনে যেত। আমাকেও যোগ দিতে বলত। ২৫শে জুলাই দুপচাঁচিয়া জাহানারা কামরুজ্জামান কলেজে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমাবেশ করে মনির। সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে বের হলে সিও অফিস বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এর পর থেকে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধরতে বিভিন্ন বাড়িতে অভিযান চালাতে থাকে।

তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তার এড়াতে বাবা মনিরকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করেন। সে কাহালুর পাইকড় গ্রামে নানাবাড়ি থাকত। সেখান থেকেই প্রতিদিন আন্দোলনে যেত। ৪ঠা আগস্ট ভাইয়ের ডাকে বান্ধবীদের নিয়ে মিছিলে গেলাম। পরের দিন বিজয় নিয়ে ঘরে ফিরলাম। কিন্তু আমার ভাই দেখে যেতে পারল না তার বুকের রক্তের বিনিময়ে ঐতিহাসিক বিজয় এ আফসোস আজীবন কুরে কুরে খাবে নাফিসাকে।

মনিরের বাবা শামছুল হক বলেন, ৪ঠা আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে মনিরের গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা তার এক সহপাঠী ফোন করে জানায়। গত ২১ দিন বাবা ডাক শুনি না, বুকটা ভেঙে যায়। সে তো কোনো রাজনীতি করত না। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকারের আন্দোলনে গিয়েছিল। পুলিশ কেন গুলি করে মারল! আমি হত্যাকারীর বিচার চাই।

[সূত্র: সমকাল, ২৭শে আগস্ট ২০২৪]

রাজশাহীতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সাথে বাজার তদারকিতেও শিক্ষার্থীরা

রাজশাহী মহানগরীর মোড়ে মোড়ে হাতে লাঠি, মুখে বাঁশি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থী। হাতের ইশারায় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন। রাজশাহী নগরজুড়ে এভাবে শিক্ষার্থীরা মিলে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন।

শুধু তা-ই নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে লুট হওয়া জিনিসপত্র ফেরত, রাত জেগে পাহারা দেওয়ার মতো কাজেও রয়েছেন তারা। সবশেষ শুক্রবার বাজার তদারকিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এই শিক্ষার্থীরা।

৯ই আগস্ট শুক্রবার দুপুরে রেলগেট, তালাইমারী, লক্ষ্মীপুর ও সাহেববাজার জিরোপয়েন্টসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দেখা গেল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে রয়েছে আনসার সদস্যদেরও। শিক্ষার্থী ও আনসার সদস্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। বৃষ্টি হলে কেউ কেউ ভিজছেন। তাদের হাতে চকলেট থেকে শুরু করে দুপুরের ভারী খাবার পর্যন্ত নগরবাসী পৌঁছে দিচ্ছেন।

প্রথম শ্রেণির শিশু সাফিয়া জান্নাত সেজদা ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সিরাতুল জান্নাত রুকু নামের দুই বোন নগর ভবনের সামনে নিয়ে এসেছে খাবার। তারা নগরের কাদিরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। সেখানে দায়িত্ব পালন করছে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

রায়হান নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, শিক্ষার্থীরা যে বিজয় এনেছেন, তা শিক্ষার্থীদেরই ধরে রাখতে হবে। এখানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীরাই মাঠে রয়েছেন। তাদের সাধারণ মানুষ খুবই প্রশংসা করছেন। তারা চান সবাই মিলে দেশটাকে সাজাতে।

এদিকে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীদের একটি দল রাজশাহী নগরের সাহেববাজার এলাকায় বাজার তদারকি করেছেন। তারা দোকানে দোকানে গিয়ে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য দেখেছেন। কয়েকটি দোকানে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করার বিষয়টি নজরে এলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীদের

পণ্যের বিক্রয়মূল্যের তালিকা ঝোলানোর নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

অপরদিকে, রাতের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে ‘সেভ রাজশাহী’-এর শিক্ষার্থীরা। তারা নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ বিভিন্ন স্তরে নিরাপত্তা দিচ্ছেন। একটি দল পাহারা দিচ্ছে এ এইচ এম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যান। পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি পশুপাখিরও খাবারের ব্যবস্থা করছে তারা। এছাড়াও কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ দল রাতে টহল দিচ্ছে।

তাওকীর ইসলাম বলেন, রাজশাহীর নিরাপত্তায় ছাত্র-জনতাসহ সব শ্রেণির মানুষ যোগ দিয়েছেন। শুধু রাতের বেলায় নয়, দিনের বেলায়ও কোথাও কোনো সমস্যা হলে তাদের টিম চলে যাচ্ছে।

এদিকে নগরের দেয়াল লিখনের কাজও করছেন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দল। একদিকে দেয়াল পরিষ্কার করছেন তারা, আবার রংতুলিতে নানা স্লোগানও ফুটিয়ে তুলছেন। ‘বর্ণিল রাজশাহী’ নামে শিক্ষার্থীরা নগরের শাহমখদুম কলেজের সামনের দেয়ালে বিভিন্ন স্লোগান লিখছেন।

এখানে ৫ই আগস্ট সংঘর্ষে নিহত হন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাবিব আনজুম নামের একজন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রাজশাহী কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী আলী রায়হান। এই এলাকায় তাদের স্মরণে গ্রাফিতি আঁকা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ফুটিয়ে তুলছেন ‘নিজের আওয়াজ নিজে তুলি, গণতন্ত্র বজায় রাখি’, ‘দেশকে ভালোবেসে আগলে রেখো’ ইত্যাদি স্লোগান।

দেয়ালজুড়ে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণ করা হবে বলে জানালেন রাজশাহী কলেজের গণিত বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সোমাইয়া আনোয়ার। তিনি বলেন, রাজশাহীর এই জায়গায় তাদের দুই ভাই শহিদ হয়েছেন। এখানে তাদের স্মরণ করা হবে।

এছাড়া নগরের বিভিন্ন এলাকায় দেয়ালে দেয়ালে তারা নতুন বাংলাদেশের আহ্বানে নানারকম স্লোগান, ছবি আঁকবেন। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রয়েছেন।

[সূত্র: পদ্মাটাইমস২৪.কম, ৯ই আগস্ট ২০২৪]

চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থাকল গুলিতে নিহত রিতার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৫ই আগস্ট বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার মিরপুর-২ এলাকায় ওভারব্রিজের নীচে পুলিশের গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কলেজছাত্রী রিতা আক্তার। জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার পুনট ইউনিয়নের তালখুর গ্রামের এই মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে চিকিৎসক হবেন। মেয়ের স্বপ্ন পূরণে বাবা আশরাফ আলী ঢাকায় এসে রিকশা চালাতেন, মা রেহানা বিবি বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজ করে মেটাতেন ঢাকায় মেয়ের পড়াশোনার বিপুল খরচ। তাদের সব পরিশ্রম, সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে রিতার মৃত্যুতে। মেয়েকে হারানোর পর দুই মাসের কাছাকাছি সময় কেটে গেলেও দুর্ভাগা এই মা-বাবার কান্না যেন এখনও শেষ হচ্ছে না। আশরাফ আলী ও তার স্ত্রী রেহানা যেন সব কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে তারা এখনও বলছেন, স্বপ্ন পূরণ দূরের কথা, রিতা লাশ হয়ে ফিরে এসেছে গ্রামের বাড়িতে। এখন আর কী হবে কাজ করে।

মিরপুরের দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন রিতা। গত বছর এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে রিতা জয়পুরহাট থেকে এসেছিল ঢাকায়। মেয়ের লেখাপড়ার কথা ভেবে কয়েক মাস আগে গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় চলে আসেন আশরাফ আলী ও রেহানা বিবি। ঢাকার মিরপুর-২ এলাকায় একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন তারা। আশরাফ আলী রিকশা চালাতেন, রেহানা কাজ করতেন বাসাবাড়িতে। রিতার বড়ো ভাই রাকিব ইসলাম কাজ করেন ট্রাকচালকের সহকারী হিসেবে। ভালোই চলছিল তাদের সংসার। কিন্তু রিতার মৃত্যু এলোমেলো করে দিয়েছে পরিবারটিকে।

২৭শে সেপ্টেম্বর কালাইয়ের আনি ফকির-পুনট সড়কের পাশে তালখুর গ্রামে রিতাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাঁশের বেড়া দেওয়া দুটি ঘর। একটি ঘরে রিতার বইগুলো সেলফে সাজানো। পাশেই রয়েছে বিভিন্ন সময়ে তার পাওয়া পুরস্কারগুলো। কথার ফাঁকে বার বার রিতার পোশাক ও বই নিয়ে মা রেহানা বিবি কাঁদছিলেন। বাবা আশরাফ আলী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন বোবার মতো। মেয়েকে হারিয়ে ঢাকায় থাকার উৎসাহ হারিয়েছেন তারা।

জানা গেছে, গত ৫ই আগস্ট সকালে রিতা এক বান্ধবীর ফোন পেয়ে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিতে বাসা থেকে বের হন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গুলিতে রিতা নিহত হলেও সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পাননি বাবা-মা। মেয়েকে ঘরে ফিরতে না দেখে অনেক খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে গিয়ে রিতার মরদেহ শনাক্ত করেন বাবা-মা। হাসপাতাল থেকে রিতার মরদেহ গ্রহণের পর পরদিন লাশ গ্রামের বাড়ি নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। আশরাফ আলী বলেন, যার জন্য গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় গিয়েছিলাম, সেই যখন নেই, তাহলে ঢাকায় থাকব কেন? ঢাকা শহরকে আমি ঘৃণা করি। আমি আমার মেয়ে হত্যার বিচার চাই।

রেহানা বিবি বলেন, মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে ঢাকায় গিয়ে বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেছি। তাতে আমার কষ্ট নেই; কিন্তু আমার মেয়েকে কেন গুলি করে হত্যা করা হলো সেটাই ভুলতে পারছি না। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের কী অপরাধ ছিল? ওরা বরং আমাকে গুলি করে মেরে ফেলত। আমি আমার মেয়ে হত্যার বিচার চাই।

[সূত্র: সমকাল, ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪]

মৃত্যু-অধ্যাস

রফিকুর রশীদ

সকালের রাউণ্ড শেষ করে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাবার মুখেই একজন রুগির কাতর কণ্ঠের আহ্বানে ডাক্তার সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। পিছনে ফিরে তাকান। বুঝতে চেষ্টা করেন এই আহ্বানটি ডান দিকের সারি থেকে এল, নাকি বাম দিকের! কত নম্বরের রুগি? দেখা গেল ১৮ নম্বর বেড থেকে এক রুগি পা নামিয়ে আকুল হয়ে ডেকে চলেছেন,

– স্যার, এই যে আমি রবিউল আউয়াল।

কদমফুলের মতো মুখভর্তি ঘন কালো দাড়ির ফাঁকে এক চিলতে হাসি ছড়িয়ে ডাক্তার সাহেব জানিয়ে দেন,

– না, আজ কিছুতেই ছুটি হবে না।

– ছুটির কথা নয় স্যার, আমার একটা অন্য কথা ...।

ডাক্তার সাহেব না বলে বয়স্ক লোকটি 'স্যার' বলেই সম্বোধন করেন। জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন, ছোট্ট ঐ সম্বোধনে অপরিসীম জাদু আছে মধু আছে; অন্য সম্বোধনে অনেকেই রুষ্ট হন। কিন্তু তরুণ এই ডাক্তার সাহেবের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কিছুই তেমন স্পষ্ট হয় না।

ডাক্তার সাহেবের কত কাজ! এই ওয়ার্ড থেকে বেরিয়েই পাশের ওয়ার্ডে যেতে হবে। তাড়া আছে। সিস্টার আয়া ট্রলি ঠেলে এগিয়ে গেছে। ১৮ নম্বরের রবিউল আউয়াল একজন রিটায়ার্ড শিক্ষক জেনে রাউন্ডের সময় প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় অনেক কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। রুগির নাম নিয়ে হালকা একটুখানি রগড়ও করেছেন। রবিউলের সঙ্গে তো ইসলাম কিংবা হক হতেই দেখি, আপনার এই আউয়াল তো বিশেষ শোনা যায় না! তখন শিক্ষক-রুগি নিজে থেকেই ব্যাখ্যা দেন, ওটা চান্দ্রমাস বা আরবি মাসের নাম এবং ঐ মাসেই তার জন্ম। সেই জন্যে নামকরণ হয়েছে ঐ রকম। এই নামটা নিয়ে তার ভেতরে ভেতরে খানিক অহংকারও

আছে, বুঝা যায়। নিজের নামকরণের বৃত্তান্ত শুনিয়েও মন গলাতে পারেননি ডাক্তার সাহেবের। তিনি ছুটি তো দেনইনি, বরং চিকিৎসা সংক্রান্ত নানান খোঁজখবর নেওয়ার পর রুগির ফাইলে আরও দুটো টেস্টের অ্যাডভাইজ লিখে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এখন ছুটি হবে না। ১৮ নম্বরের সেই রবিউল আউয়ালের ডাক শুনে তো তার ছুটির কথা মনে হতেই পারে। কিন্তু অবাক কাণ্ড হচ্ছে ছুটির প্রসঙ্গ না তুলে তিনি হঠাৎ ডাক্তারের কাছে জানতে চান,

– আজ কয় তারিখ বলতে পারেন স্যার?

– তারিখ! ডাক্তার বিস্মিত হন, চোখ কপালে তুলে বলেন, তারিখ তো ফাইলেই লেখা আছে।

– ঐ তারিখ না স্যার, আরবি মাসের আজ কত তারিখ যেন...

ডাক্তার সাহেব আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে গটগট করে বেরিয়ে যান ওয়ার্ড থেকে। ভেতরে ভেতরে গজগজ করেন, মানুষ এখন বাংলা মাসেরই খবর রাখে না, আর উনি নেবেন আরবি মাসের খবর! রিটায়ার করলে কি মানুষের এই দশা হয়! নিজে শিক্ষক-পিতার সন্তান বলেই তিনি একটু বেশি পাত্তা দিয়েছেন এই রবিউল আউয়ালকে, তাই বলে এখন আরবি মাসের তারিখ বলতে হবে! প্রাত্যহিক জীবনে ইংরেজি সন-তারিখে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে কজনই বা রাখে ঐ হিসাব! রমজান মাসের কথা আলাদা। ক'টা রোজা হলো, ঈদ আসতে কদিন বাকি, এবার তিরিশ রোজা হবে কিনা ... মুখে মুখে তখন চলে এই সব বিশ্লেষণ। তাই বলে অন্য মাসের দিন তারিখের খবর কে রাখে!

কিন্তু রবিউল আউয়ালের যে খুবই প্রয়োজন এই তারিখটা জানার!

মাইক্রোফোনে ফজরের আজান শুনে ঘুম ভাঙতেই ধসমস করে উঠে বসেন রবিউল আউয়াল। হাসপাতালের ধবধবে বিছানায় শিমুল ফুলের মতো রক্তের ছোপ দেখে চমকে ওঠেন। উঠে দাঁড়িয়ে পরনের লুঙ্গি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে সহসা ধপাস করে বসে পড়েন। রক্তাক্ত জায়গাটা শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেছে, তবু কৌশলে সেটা লুঙ্গির ভাঁজে আড়াল করতে গিয়ে মনে পড়ে যায়– মৃত্যুর পূর্বে তার পিতারও পশ্চাদ্দেশ থেকে এ রকম রহস্যময় রক্তক্ষরণ ঘটেছিল, এমনকি তার বড়ো ভাই রমজান আলীও রক্ষা পায়নি ভয়ংকর এই রক্তরোগ থেকে। না, রোগের নাম ঠিক ওটা নয়; পরে জেনেছেন অর্শ নাকি পাইলস রোগের লক্ষণ ওটা, অনিয়ন্ত্রিত রক্তক্ষরণ। এ রোগের ধারা বংশানুক্রমিকভাবে প্রবাহিত হয় এমন কথা শোনার পর থেকে তক্কেতক্কে সতর্ক থেকেছেন রবিউল আউয়াল, বাষট্টি বছর পর্যন্ত নিজের দেহে তেমন লক্ষণ না দেখে ধরেই নিয়েছেন– এই রক্তছোবল থেকে হয়ত তিনি বেঁচেই গেলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো কই! রক্তের আল্পনা দেখার পর হেমন্তের এই গা-শিরশিরে ভোরেও তার কপালে ঘাম ফোটে, খুব তেষ্টা পায় এবং প্রবলভাবে জানতে ইচ্ছে করে রবিউল আউয়াল মাসের আজ কদিন হলো!

আঙুলের কড়া মিলিয়ে মনে মনে হিসাব মেলাতে চেষ্টা করেন, এবারের এ দফায় তার হাসপাতালবাস কদিন হলো যেন! হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে রবিউল আউয়াল মাসের গোড়ার দিকেই এসে ভর্তি হয়েছেন। তার মানে সপ্তাহ খানেক গড়িয়ে গেছে! না, ভর্তি হতে তো চাননি তিনি। উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছিলেন বুকের বাম পাশে সামান্য ব্যথা নিয়ে, চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছে তাঁর। তা হলো না পিন্টুর জন্যে। রকিবের সঙ্গে প্রাইমারিতে একই সঙ্গে পড়েছে, ডাক্তার হয়ে নিজ উপজেলায় পোস্টিং পেয়েছে তরিকুল ইসলাম পিন্টু। প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে তো বটেই, প্রিয় বন্ধুর বাবা হিসেবেও রবিউল আউয়ালকে যথেষ্ট সম্মান করে সে। তার ষড়যন্ত্রেই এবারের এই ভর্তি হওয়া। কত রকম তর্জনগর্জন তার– আপনার অসুস্থতার কথা কিন্তু রকিবকে আমি বলে দেব চাচা। এবার সুস্থ হলেই আপনি ছেলের কাছে চলে যাবেন। একা একা এ বাড়িতে থাকার কী দরকার! কেন এভাবে পড়ে থাকবেন?

তাই তো, কী যে দরকার এখানে এই বাড়িতে পড়ে থাকার, সে-কথা কাউকে বুঝাতে পারেন না রবিউল আউয়াল। সামান্য মাস্টারির পয়সায় সংসার চালিয়ে রকিবের মা এই গাছপালা ঘেরা বাড়িটা তৈরি করে রেখে গেছে। এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে তার শান্তি হয় না। একমাত্র কন্যা অনু থাকে স্বামীর সাথে কানাডায়, সেখান থেকেই কান্নাকাটি করে, দূরের দেশে বাপকে নিয়ে যেতে চায়, রকিবের সঙ্গে ফন্দি-ফিকির আঁটে– এসবই তার কানে আসে, কিন্তু কানে তুলতে চান না। এনজিও-র চাকরি রকিবের,

থাকে পটুয়াখালী; মাতৃবিয়োগের পর সে বহু চেষ্টা করেছে জন্মাদাতা পিতাকে নিজের কাছে এনে রাখতে, পারেনি। নদী-নালা দেখলে নাকি তার ভয় করে। সোজাসাপটা জানিয়ে দেন, শুকনো ডাঙার মানুষ আমি নদীতে ডুবে মরব নাকি! চাকরি থেকে রিটায়ার্মেন্টের পরপর খুব একচোট টানাটানি হয়, রবিউল আউয়াল অনড়। এতদিন পর পিন্টু খুঁচিয়ে কী করবে! তার কলমের ক্ষমতায় সে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে সাধ্যমতো চিকিৎসা দেয়। রবিউল আউয়াল এক সপ্তাহের মধ্যেই যথেষ্ট সুস্থতা বোধ করেন, বুকের বাম দিকের ব্যথাটা ডান দিকে সরে গিয়ে ঘন মেঘ হয়ে আসে, তিনি বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ছুটি চান, কিন্তু ছুটি মেলে না। তাঁর অনুমান, এর পিছনে পিন্টুর চক্রান্ত আছে। তাই আজ সকালের নতুন ডাক্তারটিকে তিনি 'স্যার' ডেকে বিশেষভাবে ভজাবার চেষ্টা করেন। রাতে ঘুমের ঘোরে সামান্য রক্তক্ষরণের ঘটনাটি একেবারে চেপে যান। বিছানার চাদরের রক্তের দাগ নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে কথার চাতুর্যে নিজের নামের মাহাত্ম্য তুলে ধরেন, কিন্তু ডাক্তারের মন গলে না কিছুতেই। অথচ অল্পবয়সি ডাক্তারের ফর্সা গালে ঘন কালো চাপ দাড়ি দেখে এবং তার নম্রতা ভদ্রতা দেখে রবিউল আউয়ালের অন্তরে অন্যরকম ভাবান্তর হয় বলেই তিনি সাহস করে তাঁর কাছে আরবি মাসের তারিখ জানতে চান। কিন্তু শেষমেশ কী হলো তার ফলাফল!

ব্যাপারটা হয়ত কারও কাছে পাগলামি মনে হতে পারে, রবিউল আউয়াল সেই ভোরবেলা থেকে এ ওয়ার্ডের দুচারজন রুগি অথবা অ্যাটেন্ডেন্টকে আরবি মাসের তারিখ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তাদের চোখেমুখে সেই রকম ইঙ্গিত ফুটে উঠতেই দেখেছেন, তবু সেই তারিখ জানার ছটফটানি একটুও কমে না তার। কেন যে এত কৌতূহল, কেন এই ছটফটানি, লোকে তার কী বুঝবে! যারা তার জন্মমাসের খবর জানে, তারা হয়ত ভাবতে পারে লোকটা বুড়ো বয়সে জন্মদিন নিয়ে বড্ড আদিখ্যেতা করছে। বাস্তবে তো মোটেই তেমন কিছু নয়। দীর্ঘ এই বাষট্টি বছরের জীবনে কখনোই তার জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়নি। রং বেরঙের বেলুন ঝুলানো, মোমবাতি জ্বালানো, কেক কাটা– ফালতু এসব ছেলেমানুষির কী বা মানে হয়! সামান্য এক স্কুল মাস্টার, সে যাবে জন্মদিনের ভড়ং করতে!

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় শয্যাকন্টক হয় রবিউল আউয়ালের। বিছানা থেকে দুই পা নামিয়ে আকুল হয়ে এদিকে সেদিকে তাকান। ডাক্তারের রাউন্ড হয়ে যাবার পর এই সময়টাতে দর্শনার্থীদের ভিড় হয়, সারা ওয়ার্ড গমগম করে মানুষের কথাবার্তায়। তার তো তেমন কোনো ভিজিটর নেই, বিশেষ কেউ খোঁজ নিতেও আসে না। তা নিয়ে অন্তরে তেমন খেদও নেই তার।

বড়ো ভাইয়ের ছেলে ইমান আলী একদিন এসেছিল দুটো ডাব হাতে করে। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। এই ইমান আলীর দুই ছেলেমেয়ে সাংঘাতিক গা-ন্যাওটা তার, দিনরাত দাদুর কাছে এটা-সেটার আবদার, তাদেরও কোনো খবর নেই। বাড়ি থেকে এই হাসপাতালের কতই বা দূরত্ব, বউমাও তো পারে রিকশায় চেপে একবার এসে ঢুঁ মেরে যেতে! চাচা-শ্বশুর আর আপন শ্বশুরে তফাৎ কী!

কারও কাছেই বড়ো কোনো প্রত্যাশা নেই রবিউল আউয়ালের। মনে মনে স্থির করে ফেলেন, কাউকে কিছু না বলে কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করে এই মুহূর্তে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করবেন। কিন্তু বেড থেকে নেমে দাঁড়াতেই রক্তখচিত বিছানার চাদরে দৃষ্টি আটকে যাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ভাবনা হয়– এই যে রক্তক্ষরণের ব্যাপারটা ডাক্তারের কাছে চেপে যাওয়া কি ঠিক হলো! তার বড়ো ভাই এবং পিতার মুখ মনে পড়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে খুব কাছে থেকে দেখেছেন তাদের। দুজনেরই মৃত্যু হয় একষট্টি বছর বয়সে এবং মৃত্যুর পূর্বে আচমকা রক্তক্ষরণ হয়। সেই রক্তক্ষরণই যে মৃত্যুর কারণ, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবু বুকের খুব গভীরে কালো কাক কু গেয়ে ওঠে। তখন ভয় হয়, তারও কি মৃত্যুপ্রহর এগিয়ে এলো! বড়ো ভাই এবং জন্মাদাতা পিতার মৃত্যুর কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে, একষট্টিতেই গত হয়েছেন তারা। দাদুর মৃত্যুর সনতারিখের হিসাব তার জানা নেই, হয়তবা তারও একষট্টির গেরো পেরুনো হয়নি। এমনই অনুমান হয়। গত বছর তার নিজের তো একষট্টি পেরিয়েছে, কাজেই পা হড়কাতে কতক্ষণ!

ওয়ার্ডে ঢোকার সময় দরজার মুখে আজাদ মওলানাকে এগিয়ে আসতে দেখে রবিউল আউয়ালের মনে আবারও আরবি মাসের তারিখ জানার ইচ্ছে জাগে এবং দুপা এগিয়েও যান।

এতদঞ্চলের বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা মওলানা আবুল কালাম আজাদও ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকেই রবিউল আউয়ালকে সালাম দিয়ে সামনে এগোতে চান। তাঁর ছোটোভাই জমি-জায়গার বিরোধে মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে এসেছে, কাজেই তার দাঁড়াবার সময় নেই। এসব না বুঝে রবিউল আউয়াল সকাতরে জানতে চান,

– আরবি মাসের আজ কত তারিখ হুজুর?

কোনো জবাব না দিয়ে মওলানা আজাদ ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে যান আহত ভাইয়ের বেডের দিকে। রবিউল আউয়ালও পায়ে পায়ে অনুসরণ করে তাকে। ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তের বেডে মাথায় ব্যান্ডেজবাঁধা দাড়িওয়ালা লোকটিকে বেশ চিনতে পারেন। তার মাথার সাদা ব্যান্ডেজে রক্তের ছোপ দেখে বুকের মধ্যে দুলে ওঠে, মাথার ভেতরেও চক্কর দিয়ে ওঠে, বিছানার চাদরের রক্তাক্ত মানচিত্র ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়; এ অবস্থায় মওলানা সাহেবকে আরবি মাসের তারিখ জিজ্ঞেস করা আর হয় না। বার বার মওলানা সাহেবের চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবার পর তিনি সেখান থেকে ধীরে ধীরে সরে আসেন এবং আসার পথে তার পরিত্যক্ত বিছানার চাদরে খচিত রক্তকুসুমের দিকে একবার মাত্র চোরাচোখে তাকিয়ে দেখেন। ঐ একবারই দেখেন, কিন্তু সেখানে দাঁড়ান না। পাশেই প্রশস্ত করিডোর, সেইখানে এসে বাইরের মানবপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হিসাব মেলাতে চেষ্টা করেন, সত্যিই আজ রবিউল আউয়ালের কত তারিখ!

খুঁজতে খুঁজতে সহসা চোখের তারায় দপ করে জ্বলে ওঠে আলোর শিখা, দিন গণনার একটা উজ্জ্বল মাইলফলক পেয়ে যান, তার মনে পড়ে যায়– এই যে গত পরশু চলে গেল ঈদে মিলাদুন্নবী! তার মানে বারই রবিউল আউয়াল, আমাদের মহানবীর জন্ম এবং মৃত্যুদিন। তাহলে গতকাল ছিল তেরো তারিখ। আজ চৌদ্দ। আহা, মাত্র একটা দিনের হেরফের! গতকালই অতি নিভৃতে পেরিয়ে গেল তার বাষট্টিতম জন্মদিন! এ দুনিয়ার কেউ জানে না– রবিউল আউয়াল মাস্টার মনে মনে কী এক স্বপ্নের জলছবি এঁকে একাকী নিভৃতে দিন তারিখ গণনা করেন! কত বড়ো মহৎপ্রাণ মানুষ হলে জন্মদিনের সঙ্গে মিলে যায় মৃত্যুদিনের প্রবাহ! সেই জন্যেই তো তিনি মহামানব! নিজে অতি ক্ষুদ্র মানুষ হয়েও ভাবেন, তার জন্মটাও যদি রবিউল আউয়ালের বার তারিখে হতো, হয়ত কাকতালীয় সাদৃশ্যের কারণে মৃত্যুদিনও ঐ একই তারিখে মিলে যেতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তার জন্মতারিখ একদিন পরে, অর্থাৎ তেরোই রবিউল আউয়াল। মরহুম পিতা আরবি মাসের নামেই দুই পুত্রের নাম রেখেছেন– রমজান আর রবিউল। বড়োভাই রমজান আলীর মনের খবর তার জানা নেই, তবে অনেকদিন থেকেই মনে মনে তিনি চেয়েছেন তার নিজের মৃত্যুদিনটিও যদি ঐ জন্মের দিনেই হয়! না হোক বারোই রবিউল আউয়াল, একদিন পরে হলেও ক্ষতি নেই, জন্মমৃত্যু দিন একই সুতোর গিট হলে কী ভালোই না হয়! এমন ভাবনার কথা কখনো কোথাও প্রকাশ করার সাহস পাননি তিনি, পাছে কেউ তাকে ভুল বোঝে,

নবীর সঙ্গে নিজের তুলনা করছেন ভেবে বসে! তাই মনের এই স্বপ্ন দীর্ঘকাল আপন মনেই পুষে এসেছেন, একান্ত নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তা নিভৃতে লালন করেছেন। পবিত্র এই মাসের তেরো তারিখ এগিয়ে এলে মনে মনে একটু অন্য রকম প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন– আহা, জন্মমৃত্যু এক স্রোতে মিশে যাবে! তাঁর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে এমন অনন্য ঘটনা! বার তারিখের বদলে তেরো তারিখেই যদি সেই মহৎ ঘটনাটি ঘটে যায়! বাস্তবে হোক না হোক, এ রকম ভাবনাতেও তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ পান। একা একাই মধুর এই আনন্দযাপন করেন, মুখ ফুটে কিছুই প্রকাশ করেন না।

জন্মমৃত্যুর এমন মহাসম্মিলনের ঘটনা যে মহানবী ছাড়াও এ জগতে আরও একাধিক মানুষের জীবনে ঘটেছে বা ঘটতে পারে রবিউল আউয়াল একথা অনেকদিন মানতেই চাননি। বলা উচিত মানতে পারেননি। বিশেষ করে এ তালিকায় বেগম রোকেয়ার নাম দেখার পর মনেপ্রাণে প্রবল কষ্ট পান। কী দুঃসহ স্পর্ধা এই মহিলার, ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক বাণী বলে মানতে চায় না! বলে কি না ও সব পুরুষ রচিত সমাচার! অথচ সেও পাবে মহানবীর জন্ম-মৃত্যুর মতো সম্মানিত পুরস্কার! তাহলে আর সেই পবিত্র পুরস্কার আশা করতে রবিউল আউয়ালের দোষ কোথায়!

এ বছরও ফস্কে গেল তেরোই রবিউল আউয়াল! মনটা খারাপ হয়ে যায়। আবার সেই এক বছরের অপেক্ষা! এক বছর, নাকি বাস্তবে কত বছর ধরে এই হাত ফসকানোর খেলা চলবে কে জানে! এই হাসপাতালবাস আর মোটেই ভালো লাগে না। এক্ষুনি এখান থেকে কেটে পড়তে চান তিনি। সিঁড়ি দিয়ে নীচতলায় নেমে বাম দিকে ঘুরতেই সামনে পড়ে যায় পিন্টু, রকিবের ছোটোবেলার বন্ধু, তার প্রিয় ছাত্র। কখনো স্যার সম্বোধন করত কিনা মনে পড়ে না। দিব্যি সে চাচা বলেই ডাকে শৈশব থেকে। সেই পিন্টু ডাক্তার মাথা পেঁচিয়ে সামনে এসে জিজ্ঞেস করে,

– আপনি কোথায় ছিলেন চাচা? সেই কখন থেকে আপনাকে খুঁজে হয়রান!

রবিউল আউয়াল কথা না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন পুত্রের প্রিয়বন্ধুর মুখের দিকে। মনের ভেতরে উঁকি দেয় ভাবনা– কেন, এত খোঁজাখুঁজি কেন! পিন্টু কি তবে বিছানার চাদরে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে? এ জন্যে তার আবার শাস্তি হবে নাকি?

পিন্টু একান্ত আপনজনের মতো হাত বাড়িয়ে দেয়, জানতে চায়,

– আপনার খুব খারাপ লাগছে চাচা?

রবিউল আউয়ালের দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। পিন্টু আবারও প্রশ্ন করে,

– আপনার বেড়ে আর যাবেন না?

ফুঁপিয়ে ওঠেন রবিউল আউয়াল,

– না বাবা, আমি ছুটি চাই। বাড়ি যাব।

হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পিন্টু বলে,

– আসেন, আমার চেম্বারে বসেন চাচা।

অবুঝ শিশুর মতো আবদার জানান তিনি,

– আমি বাড়ি যাব।

– আমিই আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব, আসেন আমার সঙ্গে।

ডা. পিন্টু পরম ভক্তিভরে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে প্রিয় শিক্ষক রবিউল আউয়ালকে নিয়ে আসে নিজের চেম্বারে। চেয়ারে বসিয়ে বুকেপিঠে স্টেথো লাগিয়ে পরীক্ষার পর চোখে চোখ রেখে বলে,

– আপনার তো এখনো শরীর খারাপ চাচা। আরও চিকিৎসা দরকার।

– না, না, আমি বাড়ি যাব।

– বাড়িতে কেউ নেই, বাড়ি যাবেন কেন! রকিবকে আমি কী জবাব দেব?

রবিউল আউয়াল মরিয়া হয়ে ঘোষণা করেন,

– আমি আর হাসপাতালে থাকব না।

ডা. পিন্টু তখন পিঠের কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলে,

– আপনি আমার কাছে থাকবেন চাচা, বাড়িতে বসেই চিকিৎসা চলবে।

রবিউল আউয়াল চোখ মেলে তাকান, অবাক হয়ে জানতে চান,

– কী হয়েছে বলো তো পিন্টু!

– কেন চাচা, কী আবার হবে? রকিব তো রোজ

আপনার খোঁজ নেয়, কী বলব তাকে?

– বোলো আমি ভালো আছি, বাড়ি চলে গেছি।

– বেশ। আপনাকে আমিই রেখে আসব। এখন একটু রেস্ট নেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হন রবিউল আউয়াল,

– আমি একাই যেতে পারব বাবা। একটা রিকশা নিয়ে...।

ক্ষিপ্রহাতে চেপে ধরে পিন্টু। অনুনয় করে ওঠে,

– না না, আমি আপনার সঙ্গে যাব। একটু দাঁড়ান।

সহসা ডা. পিন্টুর চেম্বারে ঢোকেন সকালের সেই দাড়িওয়ালা নতুন ডাক্তার সাহেব। তখনই ঝপ করে উঠে পড়েন রবিউল আওয়াল। নবাগত ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় পিন্টু– আমার প্রাইমারি শিক্ষক, আমার ফ্রেন্ড রকিবের বাবা।

পিন্টুর কথা শেষ না হতেই নবাগত ডাক্তার জানতে চান,

– আরবি মাসের তারিখের কী দরকার হলো বলুন তো চাচামিয়া!

প্রসঙ্গটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ডা. পিন্টু,

– আরবি মাসের নামেই তো চাচার নাম। রবিউল আউয়াল।

এর বেশি কোনো তথ্য তার জানা নেই। জানা নেই যে এ মাসের তেরো তারিখে তার এই চাচার জন্মদিন এবং এই তারিখেই তিনি মৃত্যু প্রত্যাশা করেন। এবারের এই তেরো তারিখটা অতি সদ্য ফস্কে যাওয়ায় তার মন খারাপ, সে কথাও কারও জানা নেই। নবাগত ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সহসা তিনি বলে ওঠেন,

– আমি তাহলে যাই।

– না চাচা, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

বুক দিয়ে আগলে ধরে পিন্টু। তখন রবিউল আউয়াল নিরুপায় হয়ে বলেন,

– রকিবকে তুমি ফোন করো তো দেখি, যা বলার আমি বলছি।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করেও পিন্টু আবার সেটা পকেটে রেখে দেয়। খুবই বিনম্র ভঙ্গিতে সে বলে,

– আজ আপনার শরীর খারাপ, মন খারাপ, আজ থাক চাচা। ওর সঙ্গে আপনি না হয় পরে কথা বলবেন।

সহসা পিতৃহৃদয়ে কী যে টেলিপ্যাথিক বিক্রিয়া ঘটে কে জানে, রবিউল আউয়াল যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যান। পুত্রবন্ধু ডা. পিন্টুর দুহাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন,

– আমার রকিবের কোনো বিপদআপদ হয়নি তো বাবা?

পিন্টু চুপচাপ। নবাগত ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারেন না। রকিবের বাবা জোর দিয়ে বলেন,

– ফোনটা লাগিয়ে দাও না, ওর সঙ্গে একবার কথা বলে যাই।

পিন্টু মুখ খোলে,

– ও কথা বলবে না চাচা। আপনাকে শক্ত হতে হবে।

– কথা বলবে না রকিব! তোমাকে তাই বলেছে?

সহসা মেঘ চমকায়, বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে গত দুদিন থেকে আবহাওয়া হয়ে আছে গোমরামুখো। তাই বলে এখনই দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি নামবে, কে জানত সে কথা! পিন্টু আবারও বলে,

– আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে চাচা।

– কী হয়েছে আমার ছেলের?

সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না পিন্টু। এমন কি প্রিয় শিক্ষকের মুখের দিকে তাকাতেও পারে না। তাঁকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বলে,

– চলুন আপনাকে বাড়ি রেখে আসি।

কণ্ঠে প্রবল জিদ ধরে বলেন রবিউল আউয়াল,

– কী হয়েছে আমাকে এখনই বলো। নইলে আমি কোথাও যাব না।

পিন্টু অত্যন্ত নির্বিকার নিরাসক্ত গলায় বোমা ফাটানো সংবাদটি পরিবেশন করে– গতকাল রাতের লঞ্চে রকিব বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। নিম্নচাপের প্রভাবে নদীতে উত্তাল ঢেউয়ে লঞ্চডুবি ঘটলে সে চিরতরে হারিয়ে যায় নদীগর্ভে। খবরটি সে পেয়েছে আজ সকালেই।

চেয়ারে ঢলে পড়ার আগে রকিবের বাবা হিসাব মেলাতে পারেন– গতকাল মানে তো সেইদিনটা ছিল তেরোই রবিউল আউয়াল।

———— ○ ————

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদদের নামে রাজশাহীর বিভিন্ন চত্বরের ‘নামকরণ’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজশাহীতে তিন জন শহিদের নামে নগরীর আলুপট্টি মোড়, সাগড়পাড়া মোড় এবং ভদ্রা মোড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া নাম পাল্টে তালাইমারী মোড় এবং মুজিব চত্বরকে ‘বিজয় ২৪’ চত্বর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

১২ই আগস্ট সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সারাদেশে চলমান আওয়ামী লীগের ‘প্রোপাগান্ডা’ ও ‘বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের’ বিরুদ্ধে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে এই ঘোষণা দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘গত ৫ই আগস্ট কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জনের দিনে মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনের নির্দেশে রাজশাহীতে আমাদের তিন জন ভাইকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সেই তিন জন ভাইকে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখতে চাই। সেজন্য তিন জন শহিদ ভাইয়ের নামে তিনটি চত্বরের নাম ঘোষণা করে দিচ্ছি। সেটা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আপনার আমার। এদেশে সরকার নেই প্রশাসন নেই কিন্তু কয়েকদিন ছাত্রসমাজ খুব ভালোভাবেই দেশ চালাতে পেরেছে। তাই এই চত্বর প্রতিষ্ঠিত করাটা আমাদের জন্য খুব বড়ো বিষয় না।’

তিনি বলেন, ‘এখন থেকে রাজশাহী শহরের আলুপট্টি মোড়কে শহিদ আলী রায়হান চত্বর নামে ঘোষণা করছি। সাগরপাড়া মোড়কে আমরা রাজশাহীর প্রথম শহিদ শাকিল চত্বর ঘোষণা করছি। আমাদের আন্দোলনের সূচনা এবং বিজয় যেখান থেকে হয়েছে সেই তালাইমারী মোড়কে আমরা বিজয় ২৪ চত্বর নামে ঘোষণা করছি। সেই সঙ্গে ফ্যাসিবাদের জন্মদাতা মুজিব চত্বরের উৎপাটন করে সেটাকে বিজয় ২৪ চত্বর ঘোষণা করা হলো। শহিদ সাকিব আনজুম ভাইয়ের স্মরণে নগরী ভদ্রার মোড় হবে শহিদ শাকিব আনজুম চত্বর।’

এর আগে, গত ৫ই আগস্ট আন্দোলনরত অবস্থায় শাকিল এবং সাকিব আনজুম শহিদ হন। এছাড়া মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ই আগস্ট শহিদ হন আলী রায়হান।

[সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন, ১৩ই আগস্ট ২০২৪]

রাজশাহীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ‘শহিদি মার্চ’ কর্মসূচি পালিত

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহিদ ও আহতদের স্মরণে ‘শহিদি মার্চ’ কর্মসূচি পালন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। ৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাজশাহীর তালাইমারীতে শহিদি মার্চ কর্মসূচি শুরু হয়।

এর আগে দুপুর ৩টায় রাজশাহীর জিরো পয়েন্ট এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুইটি মিছিল তালাইমারীর দিকে রওনা হয় এবং সকলেই একত্রে হয়ে শহিদি মার্চ কর্মসূচি পালন করে।

এ সময় রাজশাহী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয় সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, আমাদের সকল শহিদ ভাইদের স্মরণ করে, সকল আহত ভাইদের শ্রদ্ধা জানাতে আজকে এই শহিদি মার্চ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আজ থেকে প্রায় এক মাস আগে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি, সেই বাংলাদেশ পাওয়ার এক মাস পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমরা আমাদের হাজারেরও বেশি ভাইকে হারিয়েছি, যারা শহিদ হয়েছেন। আমরা অসংখ্য ভাইকে আহত অবস্থায় এখনো হাসপাতালে দেখতে পাই। অনেকের হাত নেই, অনেকে তাদের পা হারিয়েছেন। অনেকে চোখ হারিয়েছেন।

এ সময় ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে’— এমন নানা স্লোগান দিতে থাকেন শিক্ষার্থী ও অংশগ্রহণকারীরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ মার্চে অংশ নিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জিরো পয়েন্ট ও তালাইমারী এলাকায় এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাদের বেশির ভাগের হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দেখা গেছে।

আম্মার আরও জানান, যে ক্ষতি তাদের পরিবারের হয়ে গেল, এই পার্থিব দুনিয়াতে সেটি পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে দাঁড়িয়ে ন্যূনতম শ্রদ্ধা জানাতে পারি। দোয়া করতে পারি। সে জায়গা থেকে আজকে একটি শহিদি মার্চ আয়োজন করা হয়েছে।

[সূত্র: নিউজনাউ টোয়েন্টিফোর, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৪]

হামার ছাওয়াল তো নাই, হামিও নাই

‘পাড়ার লোকেরা হামাক রাসেলের মা কয়া ডাকতো। একন হামার ছাওয়াল তো আর নাই, হামিও নাই’। ছেলের রক্তমাখা কাপড় হাতে নিয়ে বলছিলেন রাসেলের মা অঞ্জনা। কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে নারায়ণগঞ্জের ডিআইটি রোডে গুলিতে নিহত হন নওগাঁর রাসেল।

এদিকে এক মাত্র ছেলেকে হারিয়ে ৫ দিন ধরে কাঁদতে কাঁদতে বাক্‌রুদ্ধ রাসেলের বাবা পিন্টু। ১৮ বছরের ছেলে রাসেলের কবরের পাশে বসে বিলাপ করছেন আর ডাকছেন সৃষ্টিকর্তাকে।

জানা যায়, অন্যের জমিতে ঘর তুলে বসবাস করছেন পিন্টু। তার ২ মেয়ে ও ১ ছেলে। ২ মেয়ের মধ্যে ছোটোটা শারীরিক প্রতিবন্ধী। সবার ছোটো রাসেল। অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য রাসেল চাকরি করছিলেন নারায়ণগঞ্জের একটি তৈরি পোশাক কারখানায়। কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চলাকাল মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান রাসেল।

রাসেল নওগাঁর মান্দা উপজেলার কসবা ভোলাগাড়ি গ্রামের পিন্টুর ছেলে। তিনি নারায়ণগঞ্জের ডিআইটি রোড এলাকায় গত ১৯শে জুলাই দুপুরে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে বুকে গুলিবিদ্ধ হন। বিকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর দিন অপারেশন করে গুলি অপসারণ করা হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ২২শে জুলাই সোমবার তিনি মারা যান। পরদিন মঙ্গলবার তার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে আনা হয় এবং বুধবার দাফন করা হয়।

রাসেলের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, মা রাশেদা বেগম বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। আর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন বাবা পিন্টু। তিনি বলেন, আমি মানুষের জমিতে কাজ করি। মানুষের জমিতে থাকি। আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। ছেলেকে কবর দিয়েছি মানুষের জমিতে। আমার আয় দিয়ে পরিবারের সবার মুখে ভাত দিতেই জীবন যায়যায়। ভেবেছিলাম ছেলের পাঠানো টাকা দিয়ে অসুস্থ বউয়ের চিকিৎসা করাবো। আর হলো না। আমার সব শেষ হয়ে গেল।

তিনি আরও বলেন, আমার ছেলে কোনোদিন স্কুলে যায়নি। অভাবের সংসারে আমি কোনো সন্তানকে স্কুলে দিতে পারিনি। আমার ছেলে কোনো আন্দোলন করেনি, মিছিলে যায়নি। তারপরেও আমার ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি এখন কি করে খাব? কেমন করে চলব? কার কাছে বিচার দেব? কি নিয়ে বাঁচব?

স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য পাঞ্জাব আলী বলেন, এই গ্রামে পিন্টুর চেয়ে গরিব লোক আর নেই। টাকার অভাবে ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেননি তিনি। রাসেলই ছিল পরিবারের একমাত্র ভরসা। এখন ভিক্ষা করে খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় পিন্টুর নেই।

[সূত্র: সমকাল, ২৮শে জুলাই ২০২৪]

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর

আলম শামস

ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী, চিন্তাশীল সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক অধ্যাপক আবদুল গফুর। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক শতাব্দীরকালের সাক্ষী ছিলেন তিনি। জাতীয় বিনির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা এই শতাব্দীরই অর্জন। এসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন অধ্যাপক আবদুল গফুর। অধ্যাপক আবদুল গফুর ১৯২৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি রাজবাড়ী সদর উপজেলা খানগঞ্জ ইউনিয়নের খোর্দ্দাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নামে হাজী হাবিল উদ্দিন মুন্সী ও মাতার নাম শুকুরুন্নেসা খাতুন। ১৯৪৫ সালে স্থানীয় মইজুদ্দিন হাই মাদরাসা থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৪৭ সালে কবি নজরুল সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ভাষা আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি অংশ নেওয়ার ফলে লেখাপড়ায় কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও ১৯৬২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৪৭ সালে পাক্ষিক *জিন্দেগীতে* সাংবাদিক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তমদ্দুন মজলিশের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক *সৈনিক* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৫৭ সালে দৈনিক *মিল্লাত* ও ১৯৫৮ সালে দৈনিক *নাজাত* পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের মে থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এরপর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজি দৈনিক *পিপল*, ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত *দৈনিক দেশ* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে দৈনিক *ইনকিলাব* প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তখন থেকে পত্রিকাটির ফিচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর ১৯৫৯ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমি)-এর সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে এক বছর চট্টগ্রামে জেলা যুব কল্যাণ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ঢাকার আবু জর গিফারী কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশনা পরিচালক ছিলেন।

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি তুলেন। এসময় এর প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাসেমের সঙ্গে অগ্রণী সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভাষাসৈনিক আবদুল গফুর। ১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর তমদ্দুন মজলিসের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক *সৈনিক* পত্রিকা প্রকাশিত হলে অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রথমে এর সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি *সৈনিক* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার

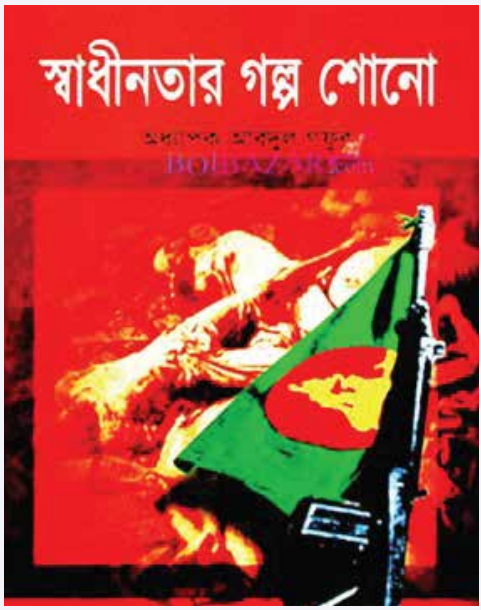

শিরোনাম ছিল 'শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণ'। ফলে ২৩শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ পত্রিকাটির অফিস অবরোধ করে সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও প্রকাশক আবুল কাসেমকে গ্রেপ্তার করে।

ভাষা আন্দোলন ছাড়াও তিনি পাকিস্তান আন্দোলন ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর তাঁর সারা জীবনই কাটিয়ে দিয়েছেন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা, এর শ্রীবৃদ্ধি এবং স্বদেশ ও স্বজাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। ভাষার জন্যে যে কলম তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সে কলম আর থেমে থাকেনি কখনো, দেশ ও জাতির দুর্যোগে তা অসির মতো গর্জে উঠেছে সবসময়।

অধ্যাপক আবদুল গফুরের উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে– *ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ইসলাম*, *বিপ্লবী উমর*, *কর্মবীর সোলায়মান*, *সমাজকল্যাণ পরিক্রমা*, *কোরআনী সমাজের রূপরেখা*, *খোদার রাজ্য*, *ইসলাম কী এ যুগে অচল*, *ইসলামের জীবন দৃষ্টি*, *রমজানের সাধনা*, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য*, *আসমান জমিনের মালিক*, *শাশ্বত নবী*, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *বাংলাদেশ আমার স্বাধীনতা*, *স্বাধীনতার গল্প শোনো*, *আমার কালের কথা* (স্মৃতিচারণামূলক, ২০০০) প্রভৃতি। অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর বহু গ্রন্থের প্রণেতা। বিবিধ বিষয়ের ওপর তিনি লিখে গিয়েছেন নিরলস। তার গদ্যশৈলী ও ভাষার প্রাঞ্জলতা তাঁকে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অধ্যাপক আবদুল গফুর সারাজীবনে সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ সংগঠক। বড়ো বড়ো লেখকদের যেমন তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নিরলসভাবে, তেমনি নতুন নতুন লেখক সৃষ্টিতে রেখে গেছেন অনন্য ভূমিকা। মূলত ইনকিলাবকে কেন্দ্র করেই তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠে একটি দুর্বার সাহিত্য আন্দোলন। সম্ভাবনাময় বহু তরুণ লেখককে তিনি সহায়তা করেছেন খ্যাতির শীর্ষে উঠতে।

২০০৫ সালে তিনি একুশে পদক পান। অধ্যাপক আবদুল গফুর ছিলেন প্রকৃত ভাষা সৈনিক ও স্বাধীনতাযোদ্ধা। আমাদের হৃদয়ের মানুষ বহু গুণের অধিকারী ভাষাসৈনিক আবদুল গফুর ৯৬ বছর বয়সে রাজধানীর স্বামীবাগের আজগর আলী হাসপাতালে ২০২৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

আলম শামস: কবি ও সাংবাদিক

ঐকতানের বিজয়

এস এম তিতুমীর

আকাশ ভার। তার, দৃষ্টি তলে
চলে। অসংখ্য মানুষ, মানুষের ঢল
প্রমিথিউসের আগুন অবিকল। লকলকে
চোখে, দাউ দাউ। জ্বালানোর শিখা
লিখা, কপালে বর্ণমালা। কর্পোরেট বাণী
ততখানি, যতখানি ঊর্ধ্বে উঠে অমূল্য জয়
ক্ষয়, অক্ষয় প্রাণের নিশান। নেমে আসা পথ
বেহেস্তি রথ, পিচঢালা পায়ের নিচে এসে থামে
ঘামে, জনতার লোহু। নামে, ফেরারি অপমানে।

তখনো বৃষ্টি ঝরেনি। করেনি আর্তনাদ, ব্যথার শিরা
হীরা, তার মতো ছড়িয়ে দ্যুতি। প্রতিশ্রুতি, গায়ে মেখে
রেখে, হাত প্রিয় হাতে। গেলাম, এই অস্ফুট বোল
রোল, তুলে রাজপথে। ক্ষুরধার ক্ষতে, সাগর সমান বুক
সুখ, আসে পেতে দিয়ে। নিয়ে, মুগ্ধ'র জলের তরল
ঝরেছে এবার রক্ত। শক্ত, মাটির ওপর। জনতার দ্বেষ
দেশ, উত্তালে অববোধ। প্রতিরোধ, প্রতিবাদে নর-নারী
তারই, মত্ততায় প্রহ্লাদ। ইলেক্ট্রা, মেডুসা, কাসান্দ্রা
অ্যান্টিগোন, গার্গী, ইলা মিত্র, প্রীতিলতার চেতনা জারি
ভারি, শাসকের কাছে। রুদ্ধ শ্বাস, অবরুদ্ধ অত্যাচারী
আমিই পারি, ভাঙতে শৃঙ্খল, আমিই তো তনয়া-তনয়
ঐকতানের নেই পরাজয়, ওই তো বিজয়, ওই তো বিজয়।

তারা আছে

ফারদিন শামস তিমির

জমেছিল কালো মেঘ আকাশ ঘিরে
চোখ ভরা জল ছিল বুকের নীড়ে
মনে ছিল ক্ষোভ যত ঝড়ের মতো
জনতার সাথে ছিল শপথ কত।

আবু সাঈদ মুগ্ধরা, ছাড়েনিকো পথ
নির্ভীক হৃদয়েতে উড়িয়েছে রথ
ফ্যাসিস্টদের খেদিয়েছে, মুছেছে কালো
দিয়েছে আকাশজুড়ে মুক্ত আলো।

স্লোগানের সুরে ছিল জেগে ওঠা দিন
শৃঙ্খল ভাঙা রোদে, ছিল দ্রোহ-বিন
ফয়সাল, তানভীর, শেখ ফাহমিন
আরও কত ছিল তারা না জানা তামিম।

তাদের পায়ের আওয়াজে কাঁপছিল ভূমি
পায়ে পায়ে পথ রচি আমি আর তুমি
তারা শুধু একা নয়, নয় জমিনের পরে
তারা আছে এ জাতির প্রতি ঘরে ঘরে।

আবু সাঈদ সমীপে

আব্দুল্লাহ আল বাকী

জাগো বাহে
কোনঠে সবায়!

আমি জানি না এই আওয়াজ
পৌঁছেছিল কি না বেরোবিতে?
যেখানে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় আবু সাঈদ

আমি জানি না, ও ভাবতে পেরেছিল কি না
তারই দেশের একজন পুলিশ
আবু সাইদের মতোই,
যার প্রধান খাদ্য মাছ ভাত
যিনি মা কে মা বলে ডাকেন
পয়লা বৈশাখ উদযাপন করেন
১৬ই ডিসেম্বর কে বলেন বিজয় দিবস
২১শে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দেন শহিদমিনারে।

সেই লোকটি, বিনা উস্কানিতে
শৃঙ্খলা রক্ষার দায় তুলে
ওর গায়ে টার্গেট প্র্যাক্টিস করবে।

সালাম জেন জি

সুফিয়া ডেইজি

নিজের দেশের মানুষ যখন
নিজের ঘরে চাপে
বিনা দোষে দোষী করে
মারে প্রতি ধাপে।

হাজার সন্তান জেন জি যারা
টেনে ধরল লাগাম
তেজী তারা অদম্য হাত
নোটিশ দিলো আগাম।

অহংকার আর দুঃসাহসে
মারল হাজার ছাত্র
ভেবেছিল তারা হয়তো
গুটি কয়েক মাত্র।

সাঁজোয়া আর ইয়ামিন তো
চোখের তারায় ঘুরে
বুকের পাঁজর ঘেঁষে ক্ষত
রয়েছে মন জুড়ে।

আবু সাঈদ শহিদ হলো
বুক ভরা তার সাহস
দেশের জন্য জীবন দিবে
আছে কোন মানস?

বিনা দোষে তাহমিদের মা
হলো সন্তান হারা
নাইমারা নিজের ঘরে
স্বাধীনতা ছাড়া।

ছত্রিশ জুলাই গণহত্যায়
হয়নি তারা পিছু
সাহসী দল জানাই সালাম
করে মাথা নিচু।

অভ্যুত্থানের নায়কেরা

তন্ময় নিসার

মানুষ চুপ থাকে না
রাস্তায় নামে, যার নামে, তারা–
শূন্য হাতে, শুধু বুকে থাকে বুলেট-বারুদ আর আগুন,
চোখে জমে থাকা ঘুম নয়, জমে থাকা রাগ, ক্ষোভ আর লাঞ্ছনার দীর্ঘ ইতিহাস তারা ভুলে না।

শাসকের প্রাচীর অনেক উঁচু,
কিন্তু জনতার একেকটা পা এগোলেই সে দেয়াল কেঁপে উঠেছে।
কান পাতলে শোনা যায়,
শতকের পর শতক ধরে জমে থাকা হাহাকার–
শ্রমিকের, কৃষকের, মায়ের, ছেলের, শিক্ষার্থীর কণ্ঠ। তারা কেউ, শাকিল-জাফর-রাজু-সাঈদ

কেউ আর ভয় পায়নি।
ভয়ের চেয়ে ক্ষুধা বড়ো,
ভয়ের চেয়ে অসম্মান বড়ো,
ভয়ের চেয়ে স্বপ্ন বড়ো হয়ে উঠেছিল হঠাৎ।

এটি কোনো কাব্যিক বিপ্লব ছিল না,
এটি ছিল রক্তমাখা বাস্তবতা–
যেখানে পতাকার কাপড় ছিঁড়ে রুমাল হয়, চোখ মুছে, আর বুলেট ছিন্ন করে সেই হাত,
যে হাত গড়তে চেয়েছিল আগামীর ভোর।

তবু কেউ থামেনি।
কারণ এই অভ্যুত্থান কারও একার ছিল না–
এটি ছিল সেই সামষ্টিক কণ্ঠ,
যে কণ্ঠে জন্ম নেয় ইতিহাস,
আর ইতিহাস কোনোদিন থেমে থাকে না । ইতিহাসে তারই নায়ক, সাহসী যারা।

মায়ের সঙ্গে শেষ কথা নিলয়ের প্রয়োজনে শহিদ হবো তবু আন্দোলনে যাব

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গিয়ে গত ৪ঠা আগস্ট পাবনা শহরে গুলিতে নিহত হয় সিদ্দিক মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র মাহবুব হোসেন নিলয়। এরপর দেশে ঘটে গেছে বহু ঘটনা। ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে ৫ই আগস্ট পতন হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের। বিপ্লবী চেতনায় নতুন স্বপ্নে দেশ গঠনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে তরুণ সমাজ। ছেলের এই শহিদি মৃত্যুতে মা-বাবা হিসেবে এখন গর্ব অনুভব করলেও নিলয়কে ভুলতে পারছে না তার পরিবার। ১৩ই আগস্ট মঙ্গলবার পাবনা সদর উপজেলার দোগাছী ইউনিয়নের আরিফপুর বেতেপাড়া মহল্লায় নিলয়দের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, ছেলের শোকে এখনও কাঁদছেন তার মা আফরোজা খাতুন।

কাঁদতে কাঁদতে আফরোজা খাতুন জানান, ৪ঠা আগস্ট নিলয় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলেছে, যে-কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে মানুষ জীবন না দিলে, রক্ত না ঝরলে সফলতা আসে না। ছাত্রদের আন্দোলন কখনও বৃথা যায় না। প্রয়োজনে শহিদ হব, তবুও কোটা আন্দোলনে যাব। ছেলে সেই যে গেল, ফিরল লাশ হয়ে। তবু ছেলের শহিদি মৃত্যুতে বাবা-মা হিসেবে আমরা অনেক ভাগ্যবান।

নিলয়ের বাবার নাম আবুল কালাম আজাদ। নিলয়রা চার ভাইবোন। ঢাকায় শহিদ মাহবুব মুগ্ধের মতো নিলয়েরও রয়েছে যমজ বোন মাহবুবা নাজনীন। সে পাবনা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণি প্রথম বর্ষের ছাত্রী। বড়ো বোন ওয়াকিয়া নাজনীন পড়েন ঢাকা বিজনেস ইনস্টিটিউটে। বড়ো ভাই মাহাদী হাসান লিমন পাবনা বাংলামোশন ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা করছেন। ছোটোবেলায় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার কারণে নিলয় যমজ বোন মাহবুবার চেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিল।

আফরোজা খাতুন বলেন, আমার ছেলে ছোটোবেলা থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। অনেক মেধাবী আর বিপ্লবী ভাব ছিল ওর। আল্লাহ ওকে শহিদি মৃত্যু দিয়েছে। এ জন্য বাবা-মা হিসেবে আমরা অনেক ভাগ্যবান।

গত ৪ঠা আগস্ট বেলা সোয়া ১১টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে পাবনা শহরে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে নামে। পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের প্রধান ফটক থেকে তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা শহরের ট্রাফিক মোড়ে অবস্থান করছিল। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ খানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা বিক্ষোভকারীদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই নিলয় ও সদর উপজেলার চরবলরামপুর গ্রামের দুলাল উদ্দিন মাস্টারের ছেলে জাহিদুল ইসলাম নিহত হন। এ ঘটনায় গত ১১ই আগস্ট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহিম লাল, সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক প্রিন্স, আবু সাঈদ খানসহ দলটির ১০৩ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে সদর থানায় মামলা করেন নিলয় ও জাহিদের বাবা।

[সূত্র: সমকাল, ১৪ই আগস্ট ২০২৪]

অমূল্য রতন

শ্যামল দত্ত

অফিসে ঢুকেই আজ আবুল কাশেমের মনটা খারাপ হয়ে গেল। অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই অ্যাকাউন্টেন্ট গোপালবাবু বললেন, খুব খারাপ খবর আছে কাশেম সাহেব!

– কী খারাপ খবর?

– আমাদের গফুর মিয়ার ছেলেকে আজ পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

– গফুর মিয়া মানে আমাদের–

আবুল কাশেম কথা শেষ করতে পারেন না। তার আগেই গোপালবাবু বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের অফিসের পুরানো ড্রাইভার গফুর মিয়া।

কিন্তু গফুর মিয়ার ছেলে তো পড়াশুনা করত শুনেছি। গতবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ভালোভাবে পাসও করেছে। ছেলে ভালো রেজাল্ট করেছে বলে গফুর অফিসের সবাইকে মিষ্টিও খাওয়ালো।

– হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ছেলেটা যে ভেতরে ভেতরে এতটা খারাপ হয়ে যাবে গফুর নিজেও বোধহয় বুঝতে পারেনি।

– ভেতরে ভেতরে খারাপ মানে, কী করেছে ছেলেটা?

– ছেলেটা নাকি নেশাটেশা করত, মানে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিল। ...

বিষয়টা কিছুতেই মেলানো যায় না। গফুর তার এই ছেলেটাকে নিয়ে কত আশা করেছিল। ওর পাসের মিষ্টি দিতে এসে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল গফুর, স্যার দোয়া করবেন ছেলেটারে যেন মানুষ করতে পারি।

সেদিন গফুরের মুখটা ভেবে ওর ছেলেরও একটা ছবি যেন মনে মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। অফিসের টেবিলে বসে আজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে কথাই ভাবছিলেন আবুল কাশেম।

– স্যার!

– অ্যাঁ, কে?

কখন যে মহসীন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, আবুল কাশেম টের পাননি।

– কিছু বলবে মহসীন?

– ফাইলগুলো এই বেলা ছাড়তে হবে স্যার।

– ঠিক আছে, আমি দেখছি।

সত্যিই তো। টেবিলে বেশ কিছু ফাইল জমে আছে। রোজ সকালে অফিসে এসেই টেবিলে জমে থাকা ফাইলগুলো নিয়ে বসতে হয়। আজও টেবিলে এসে বসেছেন। কিন্তু কোনো কাজেই যেন মন দিতে পারছেন না। এবার মহসীন এসে তাগিদ দেওয়ায় মনে হলো, তাই তো কাজ ফেলে রাখলে চলবে না। তাই সবকিছু ভুলে ফাইলগুলো সামনে টেনে নিলেন। আর ঠিক তখনই শব্দ করে বেজে উঠল টেবিলে রাখা অফিসের ল্যান্ড ফোন। এক হাতে ফাইল উল্টাতে-উল্টাতে আর এক হাতে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন, হ্যালো।

– আবুল কাশেম বলছি।

– কী করছ?

ওপাশ থেকে মেয়েলি কণ্ঠে এমন আচমকা প্রশ্ন শুনে অবাক হন আবুল কাশেম। নিশ্চয়ই কেউ ভুল নম্বরে ফোন করেছে। তাই বললেন, কী করছি মানে আপনি কে?

– আমি গো আমি। আমায় চিনতে পারছ না?

এবার আর স্ত্রী শিরিনের কণ্ঠ চিনতে ভুল হয় না আবুল কাশেমের। কিন্তু শিরিন তো কখনও এই সময়ে অফিসে টেলিফোন করে না। মাঝে মাঝে অফিস থেকে বের হবার আগে আবুল কাশেমই স্ত্রীকে ফোন করে জানতে চান, বাসার জন্য কিছু আনতে হবে কি না! স্ত্রী বলেন, সারাদিন অফিসে পরিশ্রম করে তোমাকে আর কষ্ট করে কিছু বয়ে আনতে হবে না। কোনো কিছুর দরকার হলে বাসার আশপাশে থেকেই কেনা যাবে।

টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রেখেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন আবুল কাশেম।

আজকাল বাসার আশপাশে সবকিছু পাওয়া যায়। চাল-ডাল, মাছ-ডিম থেকে শুরু করে এমন কিছু নেই যে সেখানে নেই। সপ্তাহের বাজারের পরও টুকিটাকি যে-কোনো প্রয়োজন সেখান থেকেই মেটে। কিন্তু তারপরও আজ হঠাৎ এই অসময়ে স্ত্রীর ফোন পেয়ে চমকে উঠলেন আবুল কাশেম। নিশ্চয়ই কোনো জরুরি প্রয়োজন নাকি কোনো অঘটন?

জিজ্ঞেস করতেও সাহস পাচ্ছেন না। তারপরও বললেন, বলো কী জন্য হঠাৎ এ সময়ে ফোন করলে?

– দেখো ক'দিন থেকেই কথাটা তোমাকে বলব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি।

কী আশ্চর্য, শিরিন ক'দিন ধরে বলব বলব করেও একটা কথা আবুল কাশেমকে বলে উঠতে পারেননি। সেই কথাটা এখন হঠাৎ ফোন করে বলার প্রয়োজন হলো কেন? শিরিনের স্বভাব তো এমন না। প্রায় দুই যুগ ধরে তারা একসাথে বসবাস করছেন। আজ পর্যন্ত কখনও শিরিন এখন না পরে বলব বলে আবুল কাশেমকে এড়িয়ে যাননি। সেই শিরিন কি না ক'দিন ধরে বলব বলব করেও একটা কথা তাকে বলতে পারেননি। কথাটা কী? অধৈর্য হয়ে উঠলেন আবুল কাশেম, শিরিন কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো। আমার হাতে এখন অনেক কাজ।

– তুমি কি আমার ওপর রাগ করছ?

– অযথা রাগ করব কেন। কিন্তু কোন কথা বলার জন্য এই অসময়ে আমাকে ফোন করেছ, সেই কথাটা এবার দয়া করে আমায় বলো। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

শিরিনের কাছ থেকে অদ্ভুত কথা শুনে মনে মনে বিরক্তই হচ্ছিলেন আবুল কাশেম। আসলে এই সময়ে চায়ের কাপে চুমুক দেবার সময় পর্যন্ত থাকে না। কত দিন মহসীন টেবিলে চা দিয়ে গেছে, সেই চা অমনি পড়েই থেকেছে। খানিক বাদে চায়ের কাপ নিতে এসে মহসীন দেখে যেখানকার কাপ সেখানেই পড়ে আছে। মহসীন জিজ্ঞেস করেছে, স্যার চা খান নাই?

– ও, চা দিয়েছিলে নাকি?

– আমি আর এক কাপ চা নিয়ে আসি স্যার!

আজও মহসীন চা দিয়ে গেছে। মাত্র একবার চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া হয়েছে। তারপরই টেবিলের উপর স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা ফাইলগুলোর মধ্যে আবুল কাশেম ডুবে গেছেন। চায়ের কথা আর মনেই নেই। আর এর মধ্যেই এলো শিরিনের ফোন। ওপাশে শিরিন তখনও চুপ করে আছেন। কিছুই বলছেন না। আবুল কাশেম বললেন, কিছু বলবে নাকি ফোনটা রেখে দেব?

বোধ হয় ধমকের সুরেই কথাটা বললেন। ওপাশে শিরিনের হাতের বালার আওয়াজ পাওয়া গেল। এবার ঢোক গিলে শিরিন বললেন, আজকাল আমাদের বাবলুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন খেয়াল করেছ?

– বাবলুর মধ্যে পরিবর্তন মানে, কী বলছ তুমি শিরিন?

ফোনে শিরিনের মুখে হঠাৎ বাবলুর পরিবর্তনের কথা শুনে চমকে উঠলেন আবুল কাশেম। গফুরের ছেলের কথাটা হঠাৎ মনে হলো। আসলে ছেলেমেয়েদের জন্য এই বয়সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসময় ছেলেমেয়েদের সাথে মা-বাবার বন্ধু হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কী হয়েছে বাবলুর? আজ সকালেও খাবার টেবিলে ছেলের সাথে অনেক কথা হয়েছে। কী একটা বইয়ের নাম বলল বাবলু। বইটা নাকি ওর খুব দরকার। বই কেনার জন্য দুশো টাকাও দিয়ে এসেছেন ওকে। ছেলেটা সারাদিন পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকে। ও যে বাসায় আছে সেটা বাসায় থেকেও বোঝা যায় না। বড়ো চুপচাপ স্বভাবের। কার স্বভাব পেয়েছে ছেলেটা মায়ের নাকি বাপের? আবুল কাশেমের মনে হয় বাবলু ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। একা সংসারের সব কাজ সামলায় অথচ মুখে রা শব্দটি নেই। কিন্তু শিরিন বলে, বাবলু ঠিক তোমার মতো।

– আমার মতো মানে?

– তুমি যেমন মাথা নীচু করে বাসা থেকে বের হও, আবার মাথা নীচু করে বাসায় ফেরো– বাবলুও ঠিক তেমনি। ও পাড়ার কাউকে ভালো মতো চেনেও না।

আবুল কাশেম বাবলুর কথা ভাবেন আর গর্বে বুকটা তার ভরে যায়। ঘরে বসে থাকা চুপচাপ স্বভাবের এই ছেলেটাই প্রতিবছর ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করছে। প্রতিবেশীরা বলেন, ছেলে আপনার সোনার টুকরা। এই ছেলেকে নিয়ে আপনাকে কখনও দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

সত্যিই তাই। বাবলুকে নিয়ে কখনও কোনো চিন্তাই করেন না আবুল কাশেম। সেই বাবলুর সম্পর্কে কী কথা বলছে শিরিন। টেলিফোনে আবারও শিরিনের গলা শোনা গেল, আমি কদিন থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করছিলাম।

– কোন ব্যাপার?

আবুল কাশেম আবারও অধৈর্য হয়ে পড়েন। বাবলুর ভেতর কোন অসংগতিটা শিরিনের নজরে পড়ল, যা আবুল কাশেমের নজরে পড়েনি। শিরিন বললেন, আমার মনে হয় পড়াশুনার বাইরেও বাবলু আজকাল কিছু একটা করছে।

– কিন্তু কী করছে। সারদিন ও নিজের ঘরে পড়াশুনা নিয়ে থাকে। বাইরে কোথাও খেলতে পর্যন্ত যায় না। আজকাল যাচ্ছে।

– তার মানে, কোথায় যাচ্ছে?

– সেটা জানলে কী আর আমি তোমাকে বলতাম। তবে যাচ্ছে। রোজ বিকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ও বাসা থেকে বেরিয়ে যায়।

– নির্দিষ্ট সময় মানে, কখন?

– বিকেল চারটের পর।

স্কুল থাকলে চারটের পর বাসায় ফেরে বাবলু। পরীক্ষার পর এখন স্কুল বন্ধ। তার মানে স্কুল বন্ধের এই সময়টাতে ও কোথাও যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে বাবলু? কাদের সাথে মিশছে? গফুরের ছেলের মতো বিরাট কোনো ভুল করছে না তো? একসাথে মাথার ভেতর অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। কাজে আর মন বসে না।

পাশের রুম থেকে হঠাৎ বয়স্ক সহকর্মী গোলাম রসুল এলেন। রসুল সাহেব যেখানেই যান, তার চারপাশে সুগন্ধি পান-মশলা আর জর্দার ম ম করা ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। রসুল সাহেব মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসলেন। আয়েশ করে পানের রসটুকু গিলে বললেন, কাশেম সাহেব অসুস্থ নাকি?

– না, সে রকম কিছু না।

– তাহলে নিশ্চয়ই মানসিক অশান্তি। অবশ্য আজকাল বাজারে গেলেও মানসিক অশান্তি বেড়ে যায়। দ্রব্যমূল্য যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আমরা তার সাথে ঠিক তাল মেলাতে পারি না। ফলে সবকিছু চলে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর আমরা ছা-পোষা মানুষ হা-হুতাশ করে মরি।

নিজেই নিজের কথায় পুলকিত হয়ে গোলাম রসুল হাসতে শুরু করলেন। কিন্তু একটু পরই তার মনে হলো, যার উদ্দেশে কথাগুলো বলে তিনি পুলকিত হয়েছেন তার এই দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। গলায়

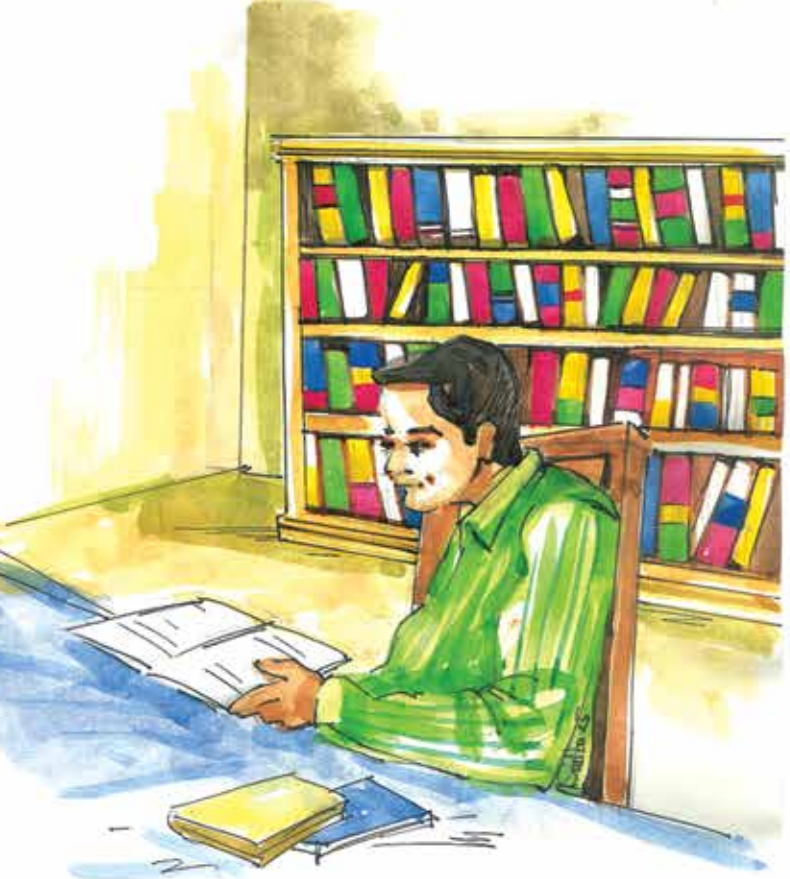

একটু কাশি দিয়ে গোলাম রসুল প্রসঙ্গ পাল্টালেন। বললেন, জানেন কাশেম সাহেব আমি নিজেই ক'দিন থেকে বড়ো দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।

দুশ্চিন্তা কথাটা শুনে আবুল কাশেম নড়েচড়ে বসলেন। আসলে দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কী। টেলিফোনের সামান্য কথা মানুষকে কতটা ভাবিয়ে তুলতে পারে, আবুল কাশেম এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। এদিকে আবুল কাশেমের নড়েচড়ে বসাকে শ্রোতার মনোযোগ ভেবে গোলাম রসুল আবারও কথা শুরু করলেন, আমার ছোটো ছেলে সুমন। ওকে তো আপনি দেখেছেন। অবশ্য ও তখন অনেক ছোটো ছিল। এখন বড়ো হয়েছে। হঠাৎ কী যে এক ভূত ঢুকেছে ওর মাথায়–

– কেন, কী হয়েছে ওর?

আবুল কাশেমের কাছ থেকে বোধ হয় এ রকমই একটা প্রশ্ন আশা করছিলেন গোলাম রসুল। বেশ শব্দ করে খানিকক্ষণ হাসলেন। তারপর ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া পানের রসটুকু রুমালে মুছতে মুছতে বললেন, এটাকে আপনি ঘোড়ারোগ বলতে পারেন।

– ঘোড়ারোগ!

– নয় তো কী। আমি বা আপনি পড়াশুনার জন্য কখনও আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া যাবার কথা ভাবতে পেরেছি?

– ও, এই কথা! আমি ভাবলাম–

– ভাবনা কী দেখেছেন কাশেম সাহেব। আসল কথা তো এখনও শোনেননি। শুনলে বুঝবেন আমি কী রকম অশান্তিতে আছি।

– অশান্তি!

– হ্যাঁ। ছেলে আমাকে রীতিমতো হুমকি দিয়েছে, বিদেশে না পাঠালে সে বাসা ছেড়ে চলে যাবে।

– চলে যাবে?

– এখানেই তো যত সমস্যা। আজকালকার ছেলেমেয়ের মতিগতি বোঝা দায়। কখন যে কী করে ফেলে কিছুই বলা যায় না। এদিকে ছেলের মা আমাকে শাসিয়েছে। বলেছে, ছেলের কিছু হয়ে গেলে সে আমাকে ছেড়ে দেবে না।

– ছেলের কিছু হবে মানে?

আবুল কাশেমের কাছ থেকে এ রকম একটা প্রশ্ন শুনে গোলাম রসুল বোধ হয় অবাক হলেন। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, অনেক কিছুই হতে পারে। ড্রাগ্‌সে অ্যাডিক্ট হতে পারে। এই যেমন আমাদের ড্রাইভার গফুর মিয়ার ছেলেটা হয়েছে।

গফুর মিয়ার ছেলের কথাটা আবার মনে পড়ায় রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন আবুল কাশেম। হাত-পা কাঁপতে শুরু করল হঠাৎ। তার চোখমুখ দেখে কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরে গোলাম রসুল এবার মুচকি হেসে বললেন, কথায় আছে তুমি যেমন বুনো ওল আমি তেমনি বাঘা তেঁতুল। ছেলে কখন-কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কাদের সাথে মিশছে– সব কিছুর ওপর আমি নজরদারির ব্যবস্থা রেখেছি।

– নজরদারি?

– হ্যাঁ। বাড়ির কাজের ছেলে রতনকে বলে দিয়েছি, এখন থেকে এটাই তোর ডিউটি। এখন রতন রোজ আমাকে রিপোর্ট দেয়। অবশ্য গোপনে। ছেলের মা পর্যন্ত জানে না। আসলে ছেলেমেয়েদের এই বয়সটা খুব মারাত্মক। ওদের চোখে চোখে রাখতে হয়।

আবুল কাশেম গোলাম রসুলের কোনো কথারই উত্তর দেননি। গোলাম রসুল নিজে থেকেই বলে যান, অবশ্য আপনার ছেলের কথা আলাদা। পড়াশুনায় কত ভালো।

আসলে বাবলুর পড়াশুনা নিয়ে আবুল কাশেমকে কখনও ভাবতেই হয় না। ছেলেটা সারাদিন পড়াশুনার মধ্যেই থাকে। ওকে নিয়ে কখনও কোনো দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে সেটা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু সেই ছেলেকে নিয়েই এখন রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথার ওপর পাহাড়ের মতো চেপে বসেছে।

দুপুরে অফিসের ক্যান্টিনে সবাই একসাথে বসে খাবার রেওয়াজটা দীর্ঘদিনের। খাবার পর কিছুটা সময় খবরের কাগজ আর রাজনীতি চর্চা– এটাও রোজকার রুটিন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এসব চলবে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের পর সবাই যে যার টেবিলে। আবুল কাশেম কোনো দিনই ভালো বক্তা নন। আবার তেমন মনোযোগী শ্রোতাও নন। তাই ক্যান্টিনের টেবিলে যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতার আসনে বসানো কিংবা টেনে নামানোর তুমুল তর্কযুদ্ধ চলে, আবুল কাশেম তখন টেবিলের কোণে পড়ে থাকা পুরানো সংবাদপত্র ঘেঁটে সাহিত্য সাময়িকীর পাতাগুলো খুঁজে বের করেন। নতুন-পুরানো যে-কোনো লেখকের গল্প-নিবন্ধ মনোযোগ সহকারে পড়েন। আজ দুপুরেও পড়ার মতো একটা কাগজ ছিল টেবিলে। কিন্তু আজ আর কাগজটা ছুঁয়েও দেখলেন না। ইচ্ছেই হলো না।

ক্যান্টিন থেকে নিজের অফিস রুমে এসে বাসার ল্যান্ড ফোনের নম্বরে কল করলেন। রোজকার মতো আজও কি শিরিন হাতের কাজ শেষ করে টেলিভিশনের সিরিয়াল দেখতে বসেছে! কিন্তু সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরলে টেলিভিশনের রিমোট আবুল কাশেমের দখলে। বিভিন্ন চ্যানেলের খবর দেখা তার নিয়মিত অভ্যেস। অথচ এই সময়টাতেও শিরিন বিদেশি চ্যানেলের কোনো সিরিয়াল মিস করতে রাজি নয়। বাবা-মায়ের এই রিমোট কাড়াকাড়ি দেখে মৃদুভাষী বাবলু হাসে। বলে, বড়ো হয়ে আমি যখন চাকরি করব, তখন তোমাদের দুজনের জন্য দুটো আলাদা টিভি সেট কিনে দেব।

বাসার ল্যান্ড ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলেছে। বিরক্ত হন আবুল কাশেম। শিরিন কি আজও টেলিভিশন সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত? শেষপর্যন্ত ফোন ধরল শিরিন, হ্যালো।

– কী করছিলে এতক্ষণ?

আবুল কাশেম তার নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হন। ওপাশ থেকে শিরিনেরও একই প্রশ্ন, কী হয়েছে তোমার?

এবার গলার স্বর স্বাভাবিক করে আবুল কাশেম প্রশ্ন করেন, বাবলু কলেজ থেকে ফিরেছে?

– হ্যাঁ, ও এখন ঘরেই আছে।

– কী করছে?

– কম্পিউটার নিয়ে বসেছে। ও এসময় ঘরেই থাকে।

– তবে যে তুমি বললে, ও আজকাল কোথাও যায়!

– হ্যাঁ, চারটার পর বেরিয়ে যায়। আজকাল রোজই যাচ্ছে।

– যেতেই পারে। সারাক্ষণ ঘরে বসে ও নিশ্চয়ই টিভি সিরিয়াল দেখা পছন্দ করে না।

– আমাকে খোঁচা দিচ্ছ দাও। কিন্তু আমি রাত-দিন তোমার মতো বই মুখে নিয়ে পড়ে থাকি না। টিভি দেখলেও চারদিকে আমার চোখ-কান খোলা থাকে। আমি বাবলুর ব্যাপারে যা দেখেছি, তা তোমাকে বললাম। এখন ওকে শাসন করার দায়িত্ব তোমার।

– শাসন করব?

– অবশ্যই করবে। ছেলেমেয়ে খারাপ কিছু করলে বাবা তাকে শাসন করতেই পারে।

– কিন্তু বাবলু খারাপ কী করেছে সেটাই তো জানি না।

সত্যিই তো, শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে ছেলেকে কী শাসন করবেন আবুল কাশেম। বিষয়টা বার বার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু শিরিন যেভাবে জোর দিয়ে বলছে, তাতে মনে হচ্ছে বাবলু বড়ো ধরনের অন্যায় কোনো কাজের সঙ্গে

জড়িয়ে পড়েছে। তবে শিরিনের এবারের কথায় ভাবনা আরও বেড়ে যায়। শিরিন বলে, দোতলার রোজী ভাবি নাকি বাবলুকে দুদিন পুলপাড়ের গলিতে যেতে দেখেছেন। রোজী ভাবির নাম শুনে আবুল কাশেম প্রথমে মনে মনে বেশ চটেই গিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা তার মেয়ে বুবলিকে প্রাইভেট পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাবলুকে। কিন্তু বাবলু রাজি হয়নি। বাবলু বলেছিল, বুবলিকে পাঠিয়ে দেবেন, ওর কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধে হলে আমি বুঝিয়ে দেব। কিন্তু প্রাইভেট পড়াতে পারব না।

সেই থেকে বাবলুর ওপর বেশ অসন্তুষ্ট। বাবলুর নামে উনি ইচ্ছে করে উল্টোপাল্টা কিছু বলছেন না তো! কিন্তু পুলপাড় বস্তির গলিটা ভালো জায়গা নয়। কিছুদিন আগেও শহরে মাদকের আখড়া হিসেবে জায়গাটা পরিচিত ছিল। কিন্তু বাবলু কেন ওদিকে যাবে। রোজী ভাবি যদি সত্যিই ওই গলিতে বাবলুকে যেতে দেখেন তাহলে তো চিন্তার বিষয়।

ঠিক চারটে পাঁচ মিনিটে আবার শিরিনের ফোন এলো, বাবলু একটু আগে বেরিয়ে গেলো।

– তুমি কিছু বলেছ ওকে?

– না, যা বলার তুমি বলো।

– আচ্ছা, আমি দেখছি।

ফোন রেখে আবুল কাশেম কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর একটু তাড়াতাড়িই বের হলেন অফিস থেকে। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে বাজে। রিকশা নিলে দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই পুলপাড় বস্তির কাছে পৌঁছানো যাবে। দেরি না করে রিকশায় উঠে পড়লেন আবুল কাশেম। রাজ্যের সব দুর্ভাবনা এখন মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে।

পুলপাড় বস্তির সামনে এসে রিকশা থেকে নেমে মনে হলো জায়গাটা খুব চেনা। অনেক দিন এদিকে আসা হয়নি। আগে পুরো এলাকাটা ফাঁকা ছিল। ডানপাশে ছিল বড়ো খেলার মাঠ আর বামদিকে পদ্মপুকুর। অবশ্য নামে পদ্মপুকুর হলেও আবুল কাশেম সেই পুকুরে কখনও পদ্মফুল দেখেননি। এখন পুরো এলাকাজুড়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আর লোহা-লক্কড়ের ছোটো-ছোটো দোকান। সেই খেলার মাঠ নেই, পদ্মপুকুরও নেই। মাঝখান দিয়ে সরু একটা গলি ঢুকে গেছে। আবুল কাশেম গলিটার দিকে এগিয়ে যান। দোতলার রোজী ভাবি কি সত্যিই এই রাস্তায় বাবলুকে ঢুকতে দেখেছেন? বাবলুর মতো চেহারার অন্য কেউ তো হতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে গলির প্রায় শেষ সীমানায় পুরনো একটা দালানের সামনে এসে দাঁড়ালেন আবুল কাশেম। পলেস্তারা খসা দালানটা শহরের পুরনো একটা লাইব্রেরি। অনেক পুরনো বই আছে এখানে। সেসব বই পড়ার লোভে আবুল কাশেম রোজ এই লাইব্রেরিতে আসতেন। হঠাৎ মনে হলো, বাবলু এই লাইব্রেরিতে আসেনি তো! মনের ভেতর কথাটা যেন হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ভাঙাচোরা সিঁড়ি পেরিয়ে লাইব্রেরির নড়বড়ে কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন আবুল কাশেম। ওই তো, পুরনো কাঠের লম্বা টেবিলটার ওপাশে একটা বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে বাবলু।

– কাউকে খুঁজছেন মনে হয়?

পুরু লেন্সের চশমা পরা লাইব্রেরিয়ান মধুসূদন বাবু কখন যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আবুল কাশেম বুঝতে পারেননি। বয়সের ভারে মধুসূদন বাবু হয়ত সেই কিশোর পাঠক আবুল কাশেমের কথা ভুলেই গেছেন। লাইব্রেরিতে কথা বলা নিষেধ। মধুসূদন বাবু ফিসফিস কণ্ঠে বললেন, এখানে কাউকে পাবেন না। আজকাল লাইব্রেরিতে কেউ আসেই না।

আবুল কাশেম হাতের ইশারায় অদূরে বাবলুকে দেখালেন। মধুসূদন বাবু বললেন, ক'দিন থেকে এই ছেলেটাই নিয়মিত এখানে আসছে দেখছি।

এরপর ফিসফিস কণ্ঠে মধুসূদন বাবু কী বললেন আবুল কাশেম কিছুই শুনতে পেলেন না। তার দৃষ্টি এখন বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকা বাবলুর দিকে। আবুল কাশেম ওখানে কাকে দেখছেন? ও কি বাবলু নাকি হারিয়ে যাওয়া কিশোরবেলার সেই আবুল কাশেম। দূর থেকে ছেলের দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকেন কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না। এই ভাঙাচোরা পরিবেশ আর অন্ধকার ভূতুড়ে ঘরে বাবলু কোন অমূল্য রতনের সন্ধান পেয়েছে, আবুল কাশেমের তা বুঝতে বাকি থাকে না।

সূর্য সন্তান

নাফেয়ালা নাসরিন

বিভেদটা শুধু দেয়ালের
তফাৎটা শুধু বিন্যাসের
কিন্তু এটাই একটা আকাশ সমান দূরত্ব তৈরি করে
এক হয়েও এক না হবার কষ্টটা বড়ো বেশি পোড়ায়
এক হয়েও এক না হবার অনুভূতি
আমাদের ভিতরে ঘুণ ধরায়, আশাহত করে।
আমাদের মধ্যে সৃষ্টিশীল যা কিছু, অঙ্কুরে বিনষ্ট করে
মাথা তুলবার সাহসটুকু নিংড়ে নিয়ে
হৃদয়টাকে ছোবড়া বানিয়ে ফেলে।

দিনে দিনে মরে যায় স্বকীয়তা, চীড় ধরে লালিত স্বপ্নের
আগুনের লেলিহান শিখা হাওয়া না পেয়ে
চিমসে যায়,অক্সিজেন হারিয়ে হাসফাস করে।
আপাত নিভে যাওয়া কয়লাতেও থাকতে পারে স্ফূলিঙ্গ
সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো প্রস্তুতি নিতে পারে উদগীরণের
নিয়ম আর আইন-কানুনের বেড়াজাল ভেঙে গুড়িয়ে
বিস্ফোরণমুখর লাভা ছুটতে পারে দিক-বিদিক
চব্বিশের জুলাই-আগস্টের সূর্য সন্তানদের মতো
হয়ে উঠতে পারে প্রতিবাদপ্রিয়, দুঃসাহসী।

জমাট বাঁধা বরফ গলাতে সুদৃঢ় প্রস্তুতির প্রয়োজন
অপেক্ষা শুধু পরিবর্তনের, আকাঙ্ক্ষা শুধু স্বচ্ছতার
পার্থক্যটা আজ অবস্থানের, অনেক অন্যায়ের মুহূর্তে
যখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, ছাই ছাপা আগুন
দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে আনাচেকানাচে।

দেয়াল নিশ্চিহ্ন করে চরম শক্তিতে শত্রুবুহ্যকে ভাঙতে
জেগে থাকুক আমাদের অমর সেনারা।

জ্বলে উঠলো জুলাই

জেসমিন নাহার

জুলাই জ্বলে উঠেনি হঠাৎ,
শহর জানে– নীরবতা আর নেই
রাস্তায় রাস্তায় ধ্বনি,
'এইবার আর থামা যায় না, এই!'

কোনো লু হাওয়া বয়নি তখনো,
তবু চোখে আগুন ছিল,
বুকের ভেতর ছিল যত লাঞ্ছনা,
সব শব্দ হয়ে উঠলো কেঁপে।

ছিন্ন পোস্টারে মুখগুলো ছিল
মজুর, শিক্ষার্থী, কবি,
তাদের স্লোগানে ফুটে উঠলো–
'আমরাও মানুষ, আমরা বাঁচি!'

সারাদিন কেঁপেছে রাজপথ,
আগুন জ্বলে উঠেছে ন্যায়ের দাবিতে
কেউ বলেছে, 'এই বিদ্রোহ নয়',
কেউ বলেছে, 'এ স্বপ্নের ভিত রচেছে।'

জুলাইয়ের সেই দিনগুলো
আসলে শুধুই ক্ষোভ নয়,
তা ছিল এক জাতির জেগে ওঠা–
স্বাধীনতার এক নতুন কথন।

আমার জান

মো. জামাল উদ্দিন

আবু সাঈদ মুগ্ধ
কোটা প্রথার কবর দিতে
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে
হয়েছো গুলিবিদ্ধ।

অসীম সাহসে পেতেছো বক্ষ
অবিশ্বাস্য কাণ্ড
বিশ্ববাসী অবাক হয়েছে
করেছে কেউবা কটাক্ষ।

আসবে না ফিরে শত শত প্রাণ
মাটিতে মিশে আছে
বেওয়ারিশ কত লাশ
স্বজনরা আজও পথ চেয়ে আছে
আসবে ফিরে আমার জান!

৫ আগস্ট

সোহেল মাহবুব

এতদিন ভোগের শাড়ির আঁচলে বাধা ছিল
আঠারো কোটি চোখের ছত্রিশ কোটি স্বপ্ন
ষোলোটি বছর ধরে কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি
করে কেটেছে স্বৈরাচারিণী
দুহাতে নিয়ে খেলেছে, খুবলেছে তারুণ্যের অধিকার
দাদার ইশারায় দুমুঠো ভাতের বদলে
জনতার মুখে-হাতে তুলে দিয়েছিল
তীব্র ক্ষুধা, বুকভাঙা আর্তনাদ আর চরম যন্ত্রণা।
এই বুঝি আছি, এই বুঝি নাই
এই বুঝি বেহিসেবি বুলেট ঝাঁঝরা করবে বুক
এই বুঝি গ্রাস করবে আয়না ঘর–
অচেনা ভয়ে আতঙ্কে কেটেছে ষোলোটি বছর।
গ্রিনিচ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী স্বৈরাচারী মনে করেছিল
তার এই পথ হয়তবা অনন্তকালের ...

এই পথে হোঁচট খাওয়া জনতা কোনোমতে
সয়ে নিলেও মানল না নিষ্পাপ কোমল প্রাণ
জোয়ার উঠল প্রতিবাদের, স্বৈরচার তার ধারালো নখ বসালো
সদ্য প্রসারিত হওয়া বুকে, বইয়ে দিল রক্ত বন্যা
বন্দুকের নলের সামনে আবু সাঈদের প্রসারিত বাহু
আর পিপাসা মেটাতে বোতল হাতে মুগ্ধতা ছড়ালো মুগ্ধ
এভাবে হাজারো প্রাণের বিনিময়ে এলো ৫ আগস্ট
আবার এলো স্বাধীনতা।

মুহূর্তের কবিতা

বিপুল চন্দ্র রায়

জীবন অদ্ভুত! কত ঘটনা ঘটে, কত ঘটনা রটে,
মুহূর্তগুলো চলে যায়, স্মৃতিগুলো রয়ে যায়।
এক যুগ সংসার করার পরেও একে অপরকে বুঝি না।
অথচ কত রজনী নিদ্রাবিহীন সন্ধি ফুটে ছিল একটি ফুল।
দিকভ্রান্ত হয়ে ঝরে গেছো কালের বাতাসে,
রক্তের দাগ কেটে কাঁটাতারের সীমানা এঁকে দিবো মনে,
এই হৃদয়ে লেখা থাকবে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ নিষেধ।

তুমি চলে গেছো, হৃদয় থেকে মরে গেছো, আর কী চাও?
আমার মৃত্যু! আমি মরবো না
বরং এলোমেলো জীবন নিয়ে দেখতে চাই, তোমার শেষ মুহূর্ত।

গণ-উত্থান

আশিকুল আলম আসিফ

জেগে ওঠে শহর, জেগে ওঠে গ্রাম
নিস্তব্ধতা ভেঙে ডাকে একতার নাম
নয়া-যুবা আঁধারের আলোকিত ধাম
সেই ঠিকানায় আসে বিজয়ের খাম ।

দেয়ালে দেয়ালে লিখা প্রতিবাদী গান
হাতে হাত রেখে গড়ে জনতার মান
শোষণের মুখে ঢালে, আগুনের বান
ফাগুনের রং আঁকে নবীন তুফান।

নই কেউ জড় আর ঘুণে ধরা প্রাণ
মুক্তির পথে থাকে করে সিনা টান
আরমান, টিটু আর শাকিল রাজু
গর্জনে ঢেউ তুলে রাঙিয়েছে বাজু।

সেই রাঙা রঙে তাই জুলাইয়ের ফুল
ছত্রিশে হাসে খুব জয় বিলকুল
সেই প্রাণ শুরু আছে শেষ নেই যার
প্রতি ভোর উত্থানে নাম থাক তার।

বৈষম্য দূর করে

আবুল কালাম তালুকদার

চলো সহস্র পথ হেঁটে ভেঙে ফেলি পৃথিবীর নষ্ট সভ্যতা
সব পথে করি সুখের আয়োজন
উষ্ণতায় কোমল করি নিজ ও পরের প্রাণ
জবা আর হাস্নার ঘ্রাণে ছুটে চলি সমবেতে
অপবিত্রতার স্নান সেরে গায়ে মাখি সু-ঘ্রাণ
ব্যর্থতা পেছনে ফেলে সফলতার দেশে চলি সৌন্দর্য সহবাসে।

চলো মানুষ হই, বৈষম্য দূর করে
দুঃখগুলি জলের সমুদ্রে ভাসিয়ে
তেপান্তর হতে নিয়ে আসি অনবদ্য সুখ
ভাবনার উৎস হতে নিয়ে ফিরি বাস্তবতার ছোঁয়া
বাংলার জমিন আর হতে দেবো না কারবালা, ফিলিস্তিন
দুর্বার আন্দোলনে জয় করি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

ঘুম আসছে না রাতে

মাসুম আওয়াল

ঘুম আসছে না রাতে
চোখ বুজলেই দেখা হয়ে যায়
আহাদ, রিয়ার সাথে।

চোখ বুজলেই সামির, ইফাত
নাঈমারা এসে দাঁড়ায়,
রক্তের স্রোতে ওদেরকে দেখে
রাত কাটে ঘুম ছাড়ায়।

ছুটে চলে আসে মোবারক, সাথে-
তাহমিদ, হোসাইন,
মায়ায় জড়ানো মুখগুলো দেখে
হই আমি রংহীন।

ওরা কেনো খায় গুলি?
কেনো উড়ে যায় চক্ষু ওদের
কেনো উড়ে যায় খুলি।

আহাদের চার রিয়া মামণিটা
ছয়ে পড়েছিলো মাত্র,
ওরা তো নামেনি পথেও, ছিলো না-
আন্দোলনের ছাত্র।

ঘরেই তো ছিলো কোন অপরাধে
শিশুদের প্রাণ ঝরলো,
বল খুনি বল অবলা শিশুরা
কেনো তোর হাতে মরলো!

ক্ষত বিক্ষত তাহমিদ কেনো
গুলি খেয়ে আজ শান্ত,
এইভাবে প্রাণ ঝরবে ওদের
ফুলগুলো তা কি জানতো!

অভিশাপ দেয় বাবারা মায়েরা
বাগানের সব ফুল রে,
মানুষ জেগেছে, ছাত্র জেগেছে
পালিয়ে পাবি না কূল রে।

তুমি কি ভুলে গেছো

আব্দুল আউয়াল রণী

যত ভাবি ভুলে যাবো
ততই স্মরণে খুঁজে খুঁজে পাতা উল্টায়।
স্মরণের স্মৃতিগুলো চোখে চোখে কথা কয়
হৃদয় কান্নায় জবান খুলে ভুলে কি গেছো আমায়।
আমি কি তোমার কেউ ছিলেম না।
আমি কি তোমার পাশে ছিলেম না।
জীবনের যতটা সময় পেয়েছিলেম
শূন্য হৃদয় অন্তর পূর্ণ করে রেখেছিলেম।
এই রূপসি বাংলায় মায়ার জগতে যতটা সময় পেয়েছি
তোমায় তুষ্টে নিবেদিতা প্রাণ নিবেদন করেছি।
তোমার আবেদন আহ্লাদ উদারতার লক্ষ্যে ব্যস্ত থেকেছি।
কখনো তোমার মনকে আঁধারে ঢাকিনি– আলোর জোছনায় রেখেছি।
আনন্দ খুশির উৎসবের জগতে– আমার আকাশে রেখেছি।
পূর্ণিমার তিথিতে ঐশী চন্দ্রিমার আলোর জোছনায়
কত আনন্দ ভ্রমণ আনন্দ খুশি মেলায় তোমার লয়ে উড়েছি
কত খ্যাতি পূর্ণ ভোগ বিলাসে তোমায় লয়ে ভোজন করেছি।
ঘরকন্নার নারীর কর্মে তোমার সহযোগিতায় মেতেছি
তোমার দুঃখ কষ্টকে ভালোবাসার আমন্ত্রণে গ্রহণ করে নিয়েছি।
মুক্ত আকাশে ধূসর মেঘের সাথে মিতালি বন্ধন হয়ে ভেসেছি।

ভালোলাগার ভালোবাসার প্রথম সিড়িতে যখন চরণ রাখি
মনে হলো স্বর্গের ফুলের বাগবাগিচায় জয়ের নিশান উড়িয়ে চলছি
আমাদের এই স্বর্গীয় বন্ধন দেখে কত যে প্রেমিক-প্রেমিকা
অবাক দৃষ্টিতে থমকে দাঁড়াতো।
তাদের ভালোবাসার মান বিচারে পরাজয়ের গ্লানিতে
মাথা নত করে চলতো।

চলে গেলেন একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা সুজেয় শ্যাম

ইসমত আরা পারভীন

একাত্তরের সহযোদ্ধা, সহশিল্পী আর স্বজনদের শ্রদ্ধার ফুল এবং রাষ্ট্রীয় সম্মানে সিক্ত হয়ে চিরবিদায় নিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী সুজেয় শ্যাম। সুজেয় শ্যাম ১৭ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

সুজেয় শ্যাম ১৯৪৬ সালের ১৪ই মার্চ সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অমরেন্দ্র চন্দ্র শাহ ছিলেন 'ইন্দ্রেশর-টি' নামের একটি চা-বাগানের মালিক। তাঁর শৈশব কেটেছে সিলেটের চা-বাগানে। দশ ভাইবোনের মধ্যে সুজেয় ছিলেন ষষ্ঠ। গিটার বাদক ও শিশুতোষ গানের পরিচালক হিসেবে ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম বেতারে কর্মজীবন শুরু হয় সুজেয় শ্যামের। পরে তিনি ঢাকা বেতারে যোগ দেন। একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শেষ গান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রথম গানটির সুর করেছিলেন তিনি। গীতিকার শহীদুল আমিনের লেখা 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই' গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেন এ সুরস্রষ্টা। ১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন সুজেয় শ্যাম। ঢাকাই সিনেমায় অবদানের জন্য তিনবার শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। সংগীতে অবদানের জন্য ২০১৮ সালে একুশে পদক দেওয়া হয় এ গুণী শিল্পীকে। তার আগে ২০১৫ সালে শিল্পকলা পদক পান তিনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুজেয় শ্যামের নাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নয়টি গানে সুর করেছিলেন সুজেয় শ্যাম, যেগুলো একাত্তরের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গাওয়া হয়েছিল। ২০০৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত ৪৬টি গানের সংকলন নিয়ে 'স্বাধীন বাংলা বেতারের গান' শিরোনামে একটি অ্যালবামের সংগীত পরিচালনা করেন তিনি। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে আরও ৫০টি গানের সংকলন নিয়ে 'স্বাধীন বাংলা বেতারের গান-২' নামে আরেকটি অ্যালবামের সংগীত পরিচালনা করেন এই শিল্পী। বাংলাদেশ বেতারের প্রধান সংগীত প্রযোজক পদ থেকে ২০০১ সালে অবসরে যান সুজেয় শ্যাম। এ শিল্পী 'টুনাটুনি অডিও' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সংগীত পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন। মঞ্চনাটকেও সংগীত পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

১৮ই অক্টোবর বেলা সোয়া ১১টার দিকে সুজেয় শ্যামের মরদেহ নিয়ে আসা হয় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে। এরপর ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই গীতিকার ও সুরকারের কফিন মুড়িয়ে দেওয়া হয় জাতীয় পতাকায়। পুলিশের একটি চৌকশ দল সেখানে এই শিল্পীকে গার্ড অব অনার দেয়। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহু শিল্পী শ্রদ্ধা জানান সুজেয় শ্যামকে। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠন শোক প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000

Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250

Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200

Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800

Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপ্স-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh
Quarterly

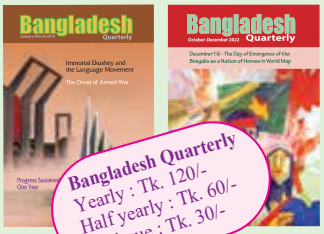

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 04, October 2024, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd